KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৩/৯ ৫৩/১০ ৫৩/১১	Year of Publication : পৌষ ১৩৯৯ // Jan 1993 মাঘ ১৩৯৯ // Feb 1993 ফাল্গুন ১৩৯৯ // March 1993 Condition : Brittle : Good
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১১ মার্চ, ১৯৯৩

'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার' শীর্ষক দীর্ঘ সন্দর্ভে ম্যাগসাইসাই-বিজয়ী সাংবাদিক-সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ একই সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন সংঘ পরিবারের শক্তির প্রাণকেন্দ্র এবং গণতন্ত্রবিধ্বংসী এই শক্তির মোকাবেলায় যারা অগ্রণী তাদের সম্ভাবনা আর সীমাবদ্ধতা।

ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রহস্যময় মনোভাব সম্পর্কে প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ লিখেছেন অমিয়কুমার সামন্ত।

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কাজী আবদুল ওদুদের জীবন ও সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎবিজ্ঞানী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা 'মাটি'।

সাম্প্রতিক শিল্পকলা প্রদর্শনী 'উদ্ভস্' সম্পর্কে অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীর প্রতিবেদন 'ক্ষত: শিল্পীর প্রতিরোধ'।

কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে কিছু অনালোচিত তথ্য পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কৃত এবারের গ্রন্থসমালোচনার কিছু বিষয়ের শিরোনাম : 'সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইতিবৃত্ত', 'সীতার বনবাস বা সত্যের বনবাস', 'রবীন্দ্রনাথ : অন্য উদ্ঘাটন' 'বাংলা গল্প উপন্যাসে বিহারের লোকজীবন' এবং 'ওপার বাংলার কবিতা'।

শিক্ষাকমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সনাতন মিত্রের প্রতিবেদন।

NIVEA

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৯৩
ফাল্গুন ১৩৯৯

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার গৌরকিশোর ঘোষ ৭২৪
ঈশ্বর, ধর্ম ও বিদ্যাসাগর অমিয়কুমার সামন্ত ৭৩৮
কাজী আবদুল ওদুদ : জীবন ও সাহিত্য কর্ম শহিদুল ইসলাম ৭৫৯
মাটি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৬৪

কবিতা

হদিশ মেলে না নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৭৩৪
কবিতার ভবিষ্যৎ হরপ্রসাদ মিত্র ৭৩৫
বেহাগ রাজলক্ষ্মী দেবী ৭৩৬
আকাশময় কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৭৩৭

গল্প

অনুভব অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ৭৫৩

গ্রন্থ সমালোচনা

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইতিবৃত্তি নিশীথরঞ্জন রায় ৭৬৮
সীতার বনবাস বা সত্যের বনবাস সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৭৬৯
প্রসঙ্গ : হিন্দু-মুসলমান নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ৭৭১
রবীন্দ্রনাথ : অঙ্ক উদ্ঘাটন শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৭৭৩
বাংলা গল্প উপন্যাসে বিহারের লোকজীবন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৭৬
ওপার বাংলার তিনখানি কবিতা সংকলন সুজিৎ ঘোষ ৭৭৮
ভর্তৃহরির শতক ত্রয় ভবানী গাঙ্গুলি ৭৮৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

১৪০০ কাজী নজরুল ইসলাম ৭৮৫
জীবনানন্দ : সেদিনের স্মৃতি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৮৭
'জিজ্ঞাসা' এবং 'প্রাকৃত' সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৭৮৯

শিল্পকলা

ক্ষত : শিল্পীর প্রতিরোধ সত্যজিৎ চৌধুরী ৭৯১

শিক্ষা

বলা সহজ, করা কঠিন : শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সনাতন মিত্র ৭৯৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT* : **AUCKLAND JUTE MILLS**)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russel Street
Calcutta-700 071

Telephones : 247-9921
247-9720
40-2680
247-7909

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT JAGATDAL
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার

গৌরকিশোর ঘোষ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ভারতের মুষ্টিমেয় কিছু ধর্মান্ধ উগ্রবাদী অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। এই ফ্যাসিস্ট শক্তি ভারতে বর্তমানে সংঘ পরিবার বলে নিজেদের জাহির করে বেড়াচ্ছে। এদের এই সর্বনাশা হঠকারিতার পরিণাম ভারত উপমহাদেশ হয়েছে ভয়াবহ। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে দাঙ্গা হয়েছে। মানুষ মরেছে, লোকে সর্বস্বান্ত হয়েছে। হিন্দু এবং মুসলমান কাউকেই খাতির করেনি হত্যাকারীরা, কাউকেই ছেড়ে দেয়নি লুণ্ঠনকারীরা।

তিনটি রাষ্ট্রেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনও রাষ্ট্রই তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনি। ধর্মান্ধ শক্তির কাছে আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এ কী শোচনীয় পরাভব!

অথচ এই তিনটি রাষ্ট্রই চলতে চেয়েছিল গণতন্ত্রের পথে : ভারতে সেকুলার গণতন্ত্রের ভিত পত্তন হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম দিনটি থেকেই। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েদে আজম জিন্নার নেতৃত্বে প্রবর্তন করার শপথ গ্রহণ করেও তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মান্ধ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কথা ছিল, রাষ্ট্র ক্ষমতা আসবে জনগণের হাতে। ধর্মান্ধ শক্তির প্রবলতায় পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে গেল স্বেচ্ছাচারী সামরিক বাহিনীর কব্জায়। মোল্লা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তি একেবারে নির্মূল হয়নি সেখানে। স্বেচ্ছাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আর এক রাখা গেল না। এক পাকিস্তান এখন দুই হল। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচার কিছুদিনের মতো বহাল রইল। বাংলাদেশে পত্তন হল গণতন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশে সেকুলার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার হোতা। ভারত সেকুলার গণতন্ত্রের পথ ধরে যে যাত্রা শুরু করেছিল, জবাহরলাল নেহেরুর ঐতিহ্যবাহী সেই যাত্রার গতি অব্যাহত রইল। পাকিস্তানে ভুট্টোর নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমেই সবল হয়ে উঠল। ফলে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সরে যেতে হল। ভুট্টোর কৃতিত্ব এইটুকু যে, তিনি অনেক দিন পরে পাকিস্তানে একটা অসামরিক এবং জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এবং সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের মাটি তখনও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। ভুট্টো সবে চাষ দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এবং এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের নাগরিকদের মন থেকে গণতান্ত্রিক ইচ্ছা মরে যায়নি। কিন্তু শেষ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবার মোল্লা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে পাকিস্তানে সামরিক শাসন চালু হল। বাংলাদেশেও ততদিনে শেখ মুজিবকে ক্ষমতান্ধ শক্তির হাতে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সেকুলার গণতন্ত্রের পথ ধরে তখনও একলা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ভারতেও ততদিনে সেকুলার গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে মূলধন করে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে

নেমে পড়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যখন গণতান্ত্রিক শক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে, ঠিক তখনই ভারতে সেকুলার গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করে তোলার জন্য নানা রকম অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে ভুট্টোর কন্যা বেনজির গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করে আবার গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন বেনজির ক্ষমতায় নেই, কিন্তু পরবর্তী সরকারও সামরিক সরকার নয়, পাকিস্তানে এখন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত সেটা রক্ষণশীল হতে পারে, তবুও সেটা জনপ্রতিনিধিদেরই সরকার। বেনজির সেখানে বিরোধী নেত্রী। বাংলাদেশেও অনেক দিন পরে সংবিধানিক গণতন্ত্র সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠা হতে পেরেছে। বেগম খালেদা রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী।

অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, এই উপমহাদেশের তিনটি খণ্ডেই বর্তমানে জনপ্রতিনিধির সরকার প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই প্রেক্ষিতেই আমাদের বিচার করতে হবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কলঙ্কময় অধ্যায়ের তাৎপর্য কী? এই এই প্রেক্ষিতেই আমাদের গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে, ভারতে কেন আমাদের সেকুলার গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করার জন্য কেন আমাদের মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে?

বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হবার সঙ্গে বিশ্বসুদ্ধ লোকের যে ধারণাটি ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, সেটা এই :

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আপন শক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এবং গণতন্ত্রকে বাঁচাতে সক্ষম।

এই ধারণা সকলের মন থেকেই বাবরি মসজিদের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়েছে। তাই, এই ধারণাটা গুঁড়িয়ে যাওয়ায় ভারতে এবং ভারতের বাইরে সমস্ত গণতন্ত্রমনা মানুষের মনে আঘাতটা এত জোরে এসে বেজেছে। ভারতের সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের আত্মতুষ্টিও গুঁড়িয়ে গিয়েছে। আকস্মিক আঘাতে তাঁদের কেউ ক্ষিপ্ত, কেউ হতভম্ব, কেউ বা বিষাদগ্রস্ত, কেউ হতাশ—সকলেই লজ্জায় অধোবদন। এঁদের সকলেই যে কথাটা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, সেটা এই : আজ ৪৫ বছর ধরে ভারত সেকুলার গণতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে শুধু মাত্র তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ঠাঁটে। জনসাধারণের মনের জমিনে সেকুলার গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে প্রসারিত করতে সেকুলার গণতন্ত্রের প্রবক্তারা পারেননি।

এখন যখন সত্যিই পালে বাঘ পড়েছে, মানে বাঘের গায়ে হিন্দুত্ববাদের গেরুয়া বসন চেপেছে, বি জে পি তথা গোটা সংঘ পরিবার ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদের নিশান উড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণ শুরু করেছে, তখন কী দেখছি? সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের শিবিরে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। সেকুলার গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহক কংগ্রেস, সমাজবাদী, জনতা দল, বামপন্থী শিবির ঠাঁই ঠাঁই। কোথাও ঐক্য নেই, কোথাও সংহতি নেই। অথচ সবাই 'ঐক্য ও সংহতি' স্থাপনের নামে পরস্পরকে আক্রমণ করে চলেছে। ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী শক্তি শুধু বাবরি মসজিদই ধূলিসাৎ করেনি, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য ও সংহতির উপরেও জোর আঘাত হেনেছে। এই আঘাতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শিবির কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রাথমিক পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি যে, হিন্দুত্ববাদী (ভারতে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদের নামই হিন্দুত্ববাদ) বি জে পি তথা সংঘ পরিবার ছলে বলে কৌশলে মসজিদ ধূলিসাৎ করে তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে এক কদম এগিয়ে রয়েছে।

(১) তারা আপাতত বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাই ভারতীয় মুসলমানের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান মান ইজ্জৎ রক্ষা করার সামর্থ্য তার নেই,

(২) তারা বোঝাতে চাইছে, সেকুলার গণতন্ত্র এক নির্জীব ভাবধারা, এটা একটা ঝুটো মতাদর্শ, এটা একটা সুবিধাবাদী মতবাদ, তাই ভারতের মঙ্গল সেকুলার গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাধিত হতে পারে না,

(৩) তারা নিরন্তর প্রচার করে চলেছে যে, ভারতে যেহেতু হিন্দুই সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী সেই হেতু হিন্দুত্ববাদই ভারতের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ, এই কারণেই হিন্দুত্ববাদ ভারতের প্রবলতর শক্তি, এবং সেই কারণেই ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে 'মেজরিটির' ভাবাদর্শ অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদকে মেনে নিতে হবে এবং এই হিন্দুত্ববাদের খুরে অন্য সকলকে মাথা মুড়োতে হবে,

(৪) তারা সকলকে বোঝাতে চাইছে, হিন্দুরাই ভারতের একমাত্র জাতিসত্তা, হিন্দু এবং ভারতীয় নেশন সমার্থক, সেই কারণেই দাবি করছে, হিন্দু এবং ভারতীয় নেশন যেহেতু একই কথা, সেই হেতু ভারতের নাগরিক মাত্রেই হিন্দু, অর্থাৎ

ভারতের মুসলমান আর "ভারতীয়" মুসলমান নয়, তাকে বলতে হবে আমি "হিন্দু" মুসলমান, এবং এই যুক্তিতেই ভারতীয় ক্রিশ্চানকে বলতে হবে, আমি "হিন্দু" ক্রিশ্চান, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি,

(৫) তারা বোঝাতে চাইছে, যেহেতু হিন্দুত্ববাদই ভারতের প্রকৃত জাতীয় চেতনা, (হিন্দুত্ববাদ কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনা নয়) হিন্দুত্ববাদ ভারতের আপামর জনসাধারণের জাতীয় চেতনা—সেই হেতু হিন্দুরাই ভারতের জনসাধারণের শক্তির এক এবং অদ্বিতীয় উৎস,

(৬) যেহেতু হিন্দুত্ববাদই ভারতের জনসাধারণের শক্তির এক এবং অদ্বিতীয় উৎস, সেই হেতু ভারতকে বিশ্বের এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রে ভারতের জনগণের শক্তির প্রকৃত ও প্রধান উৎস হিন্দুত্ববাদকে সবলে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে,

এবং ৭) যেহেতু ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতার গর্ভগৃহে অর্থাৎ দিল্লির মসনদে প্রবল হিন্দুত্ববাদকে একমাত্র সংঘ পরিবারই প্রতিষ্ঠা দিতে পারে, সেই হেতু সংঘ পরিবারকে দিল্লির মসনদে বসাতে হবে।

এটাই হল সংঘ পরিবারের 'গেম প্ল্যান' বা ক্ষমতা দখলের নকশা।

এটাই হল সংঘ পরিবারের প্রচারেরও মর্মকথা।

(দুই)

দুটি বিপরীতমুখী ঝোঁকের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা এতক্ষণ করেছি।

(১) পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, উপমহাদেশের এই দুই খণ্ডে, যেখানে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বিশেষ দুর্বল, বারবার বিপর্যস্ত হবার পরেও সেখানে গণতান্ত্রিক শক্তির মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছার প্রকাশ ঘটছে, সেকুলার গণতান্ত্রিক শক্তি জোট বাঁধছে,

(২) ভারত, এই উপমহাদেশের অবশিষ্ট এবং বৃহত্তর খণ্ডে, যেখানে গণতন্ত্রের একটা স্থায়ী ভিত্তি স্বাধীনতার পর থেকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, সেখানে সেকুলার গণতন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানতে শুরু করেছে ধর্মীয় আবেগসর্বস্ব উগ্রবাদী সংঘ পরিবার, সেকুলার গণতন্ত্রের বিনাশকারী শক্তি সমূহ ধীরে ধীরে জোট বাঁধছে।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যখন জনসাধারণ সেকুলার গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছাচারী সামরিক জুন্টা এবং তার পৃষ্ঠরক্ষক ধর্মীয় মৌলবাদের জুলুমবাজ স্বৈরশাসনের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করছে, তখন ভারতে ধর্মের বুলিসর্বস্ব সংঘ পরিবার সেকুলার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে হিন্দুত্বের তবকে মোড়া ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

তাই ভারত উপমহাদেশে আজ দুটি মাত্র শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। এ যুদ্ধে কে হারবে, সেটা সম্পূর্ণত নির্ভর করবে কোন্ পক্ষ—ধর্মীয় মৌলবাদ নির্ভর আগ্রাসী একনায়কতন্ত্র, না সেকুলার গণতন্ত্র—নিজের দিকে কতটা শক্তি সংহত করতে পারে, তার উপর। অবশ্যই এই শক্তি বলতে ঐক্যের শক্তিকেই বুঝতে হবে।

আগেই দেখেছি, সংঘ পরিবার তার ছকা গেম প্ল্যানে প্রথম রাউণ্ডে এক পা এগিয়ে গিয়েছে। তার মানে প্রচার যুদ্ধের ক্ষেত্রে সংঘ পরিবার সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরের দুর্বলতা অনেকটাই প্রকট করে দিয়েছে। ভারতে সংঘ পরিবার আজ এক প্রবল রাজনৈতিক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং তার এই রুদ্র আবির্ভাব আত্মতুষ্টিতে মোহগ্রস্ত সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 'মুর্গির খাঁচায় হলো বেড়ালের প্রবেশ' বলতে যে ছবি চোখে ভেসে ওঠে অযোধ্যায় সংঘ পরিবারের হাতে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হবার ঘটনা ঘটার পর ভারতের সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরের টালমাটাল অবস্থা দেখে অবিকল সেই ছবিই চোখে ভেসে ওঠে নাকি?

ছবিটা নিঃসন্দেহে যেমন হাস্যকর, তেমনই আবার করুণও বটে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেউই, একেবারে আক্ষরিক অর্থে বললে বলতে হয়, বিশ্বের কেউ-ই ভাবতে পারেনি ভারতে এই ধরনের হঠকারী কাজ কেউ করতে পারে। সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক ফ্রন্ট বি জে পি ভারতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল! সংবিধানকে মান্য করেই তারা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদে এসেছে। চার চারটি প্রদেশে বি জে পির সরকার প্রতিষ্ঠিত। সাংসদ হিসাবে এবং বিধায়ক হিসাবে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করবে, এই প্রতিশ্রুতি তাদের দিতে হয়েছে। বি জে পি মন্ত্রীদেরও এই শপথ নিতে হয়েছে যে তাদের অধিকারভুক্ত রাজ্যে তারা ভারতীয় সেকুলার সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। সুপ্রিম কোর্টে যে হলপনামা উত্তরপ্রদেশের সরকার দাখিল করেছিলেন, তাতে

বলা হয়েছিল অযোধ্যায় তাঁরা এমন কোনও কাজ ঘটতে দেবেন না যাতে সেখানে স্থিতাবস্থার হানি হয়। অর্থাৎ অযোধ্যায় মন্দির এবং মসজিদ নিয়ে যে বিরোধ চলছে যতদিন তার মীমাংসা না হয় ততদিন বাবরি মসজিদ অক্ষত থাকবে। এটা কারও, এমন কি উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ মহাশয়েরও, মুখের কথা নয়, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পেশ করা উত্তরপ্রদেশ সরকারের হলপনামা।

কেই বা ভাবতে পারে সংবিধানসম্মত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কোনও সরকার সেটা অগ্রাহ্য করবে?

কেই বা ভাবতে পারে, ভারতের কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ভারতের সংবিধানকে মান্য করে চলবে, জনসাধারণকে প্রকাশ্যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকসভায় ঢুকে এবং লোকসভায় বাবরি মসজিদকে অক্ষত রাখা হবে এমন অঙ্গীকার করে সেই অঙ্গীকারকে সে মিথ্যা অঙ্গীকারে পরিণত করবে?

না, ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যাঁরা অভ্যস্থ তাঁদের কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি, সংঘ পরিবার বাবরি মসজিদকে অক্ষরিক অর্থে ই ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

না, আমরা কেউই তা ভাবতে পারিনি। কারণ আমাদের, অর্থাৎ ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে এমন ধরনের রাজনৈতিক শঠতা এবং জালিয়াতির অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন, সেটা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করাই ভাল।

হ্যাঁ, আমরা যারা সেকুলার গণতন্ত্রের অনুগামী তারা বোকা বনেছি এবং আমাদের বোকা বানিয়েছে সংঘ পরিবার।

এখন এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের কোন্ শিক্ষা দিয়েছে, সেটা এবার একে একে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

মিথ্যাচার এবং বলপ্রয়োগ, আমরা দেখেছি, সংঘ পরিবারের মাত্র এই দুটি অস্ত্র আছে। অনস্বীকার্য, দুটি অস্ত্রই আপাতদৃষ্টিতে মোক্ষম। অনস্বীকার্য, এই অস্ত্র দুটি, অর্থাৎ মিথ্যাচার এবং বলপ্রয়োগ, ভারতের রাজনীতিতে এর আগে এত সফলভাবে আর কেউ প্রয়োগ করতে পারেনি, যেমন সংঘ পরিবার এবারে পেরেছে।

(৩)

এই আলোচনা আরও এগোবার আগে একবার দেখে নেওয়া ভাল, কারা এই অস্ত্র প্রয়োগ করছে। বলাই বাহুল্য তারা সংঘ পরিবার।

এই সংঘ পরিবার কারা? সেটাও একবার দেখে নেওয়া ভাল।

সংঘ পরিবারের মূল শক্তি হল আর এস এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। আর এস এস কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং নেপথ্যচারী সংগঠন। মহারাষ্ট্র এই সংগঠনের জন্মভূমি। এদের প্রতিষ্ঠা মারাঠি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর, বিশেষত মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হাতে। স্বয়ংসেবক বা স্বয়ংসৈনিক সংঘের নেতৃত্ব পুরোপুরি এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীরই নিয়ন্ত্রণাধীনে। এদের লক্ষ্য ভারতে নির্ভেজাল হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ভারতে ব্রাহ্মণ শাসিত এক 'নিষ্কলুষ' রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই নীতিতে এরা অনমনীয় এবং সংকল্পসিদ্ধিতে এরা অবিচল। ভারতে নিরঙ্কুশ ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু রাষ্ট্রতন্ত্রের পত্তন যতদিন না হবে ততদিন ভারত গ্লানিমুক্ত হবে না, ততদিন ভারত সগৌরবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হবে না, এই বিশ্বাসে এরা অনড়। একমাত্র হিন্দুত্বই ভারতকে সেই গৌরব দিতে পারে এবং সেই কারণেই ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন এদের কাছে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া নয়, এটা ধর্ম। 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে', এটা এদের কাছে ঐশীবাণীতুল্য। তাই রামায়ণ এদের গ্রন্থ নয়, রাম উদ্দেশ্যসিদ্ধির এক উপায়মাত্র। এদের গ্রন্থ গীতা। স্বরণীয়, কট্টর হিন্দুত্ববাদী যে গডসে গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন, তিনি ছিলেন মারাঠি এবং ব্রাহ্মণ এবং তার আনুগত্য ছিল গীতার প্রতি, রামায়ণে নয়। গডসে কখনও রামভক্ত ছিলেন না।

আজ সংঘ পরিবার রামাবলী গায়ে চাপিয়েছে এই কারণে নয় যে, সংঘ পরিবার রামকে মানে, রাম তাদের কার্যসিদ্ধির পথে আজ প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড বলেই তারা আজ রামাশ্রিত। রাম নামের তিলকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে বিভীষণ পুত্র তরণীসেন রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, কিন্তু রাম তাতে ভোলেননি, তিনি তরণীসেনকে বধ করেছিলেন।

এই কাহিনী আমার কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক বলেই মনে হয়।

আজকের ভারতে সংঘ পরিবার 'জয় শ্রীরাম' বলে যে নিনাদ তুলেছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় রাজনৈতিক ধাপ্পা। লক্ষ করবেন, ভক্তের ধ্বনি ছিল 'জয় সিয়ারাম'। এ ধ্বনির সৃষ্টি করেছিলেন তুলসীদাস। সংঘ পরিবার সুকৌশলে 'জয় সিয়ারাম'কে বদলে সেখানে 'জয় শ্রীরাম' এই রণধ্বনি কণ্ঠে তুলেছে।

আর এস এস তথা সংঘ পরিবার ত্রেতাযুগের লঙ্কাদহন পালার রণধ্বনি 'জয় শ্রীরাম' বিশ শতকের ভারতে আমদানি করেছে এই ভেবে যে, এর দ্বারা তারা সরল জনসাধারণের আবেগকে মথিত করে তাদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করতে পারবে। অর্থাৎ ভারতে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিতে পারবে। যেমন রাতের অন্ধকারে, চোরাপথে, বাবরি মসজিদের ভিতরে রামসীতার মূর্তি স্থাপিত করে সেটা রামের মন্দির বলে চালিয়ে দেবার জালিয়াতিতে তারা সফল হয়েছে। এইখানেই সংঘ পরিবারের গোড়ায় গলদ। সেটা পরে আলোচনা করা যাবে।

হাই জ্যাক করার মনস্তত্ত্বের একটা অসুবিধা এই যে, যারা এই কাজ করে আপাত সফলতা প্রাপ্ত হয় তারা ভাবে সব ক্ষেত্রেই বুঝি তুড়ি মেরে ঝুড়ি ভরা যায়। হাই জ্যাক করে মসজিদে মূর্তি বসানো এমন কোনও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ভারতের মাটিতে ও মনে তুড়ি মেরে হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন করা যায় না।

আর এস এস এই সত্য জানে।

এই সত্য সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদেরও জেনে রাখা উচিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা স্বয়ংসৈনিক সংঘ বা আর এস এস সম্পর্কে এই আলোচনায় একটুখানি আলাদা ভাবে বলতে হল এই কারণে যে, এই সংগঠনই সংঘ পরিবারের শরীর, মস্তিষ্ক এবং আত্মা। আর এস এস সরে দাঁড়ালে সংঘ পরিবার যথার্থই এক কাগুজে বাঘ, আর এস এস যুক্ত থাকলে সংঘ পরিবার ভারতের রাজনীতির ময়দানে এক দুর্বদ শক্তি। শুধু মাত্র মানবশৃঙ্খল রচনা করে বা মহা মহা সংহতি সমাবেশের অনুষ্ঠানের মতো শৌখিন ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংঘ পরিবার তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসৈনিকদের মোকাবিলা করা যাবে না। ভারতে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এরাই হচ্ছে অগ্রসৈনিক। 'এক লিঙ্গ কা দেওয়ান' বা 'ফওজে এলাহি' বা আধুনিক অভিধায় 'স্টর্ম ট্রুপার্স'। হিটলারি 'স্টর্ম ট্রুপার্স' বাহিনীকে এস এস বাহিনী বলা হত। আর এস এস-এর অন্তেও ইংরাজির সেই দুটি 'এস' অক্ষরই লেগে আছে। হয়ত এটা কাকতালীয়ই। রাজপুত গৌরবগাথা সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা জানেন 'এক লিঙ্গ কা দেওয়ান' কাদের বলা হত। এরা এক স্বেচ্ছাসৈনিক সংগঠন। কথিত আছে, রাজপুতানা যখন বিদেশী এবং বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হত, এবং মেবারের রাজপুত শক্তির পরাভব যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত, দেশের সেই সংকট সময়ে নেমে আসত এই এক লিঙ্গের দেওয়ানেরা। হাতে তাদের কোষমুক্ত তরবারি আর কণ্ঠে 'হর হর মহাদেও' এই রণধ্বনি। তারা কে, সে কথা কেউ জানত না। তারা কোথা থেকে আসত সেটাও কেউ জানত না। তারা পিছু হটতে জানত না। তাদের ছিল একটি নীতি, 'হয় মারো নয় মরো।' রাজপুত গাথায় এই রকমই বলা আছে। ইসলামের প্রসারের দিনে ছিল যেমন 'ফওজে এলাহি', বাংলা প্রবাদে যা হয়েছে 'খোদার সিপাহি'। এরাও পিছু হটতে জানত না। পলায়নের পথ পুড়িয়ে এরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। আর এস এস লক্ষ্যচ্যুত হতে জানে না, এবং এরা আবেগের দ্বারা আদৌ চালিত হয় না। এরা কার্যসিদ্ধির জন্য একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় জনতার ধর্মীয় আবেগকে তুঙ্গে তুলে জনতাকে মারমুখি করে তোলে, তারপর যখন সেই মারমুখি জনতা প্রলয়ংকর সব ঘটনা ঘটিয়ে দেয়, তখন ধীর মস্তিষ্কে এরা তার হিসাব নিকাশ করে পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে বসে। জনতা, যাকে ইংরাজিতে 'মব্' বলা হয়, এদের সৈনিক নয়, জনতাকে এরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সেই কারণেই প্রকাশ্যত আকার অবয়বহীন এই দুর্বার সংগঠনটি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যেতে পারে।

(৪)

কোন্ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবির সম্মুখ সমরে নেমেছে সেটা তাদের জেনে রাখা ভাল। লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী এই প্রচারবিমুখ সংগঠন, যার নাম আর এস এস পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই কত শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে সে খবরও এই রাজ্যের সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরের মহারথীগণের জেনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা জানতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করুন। এই রাজ্যে নন্দলালই দীর্ঘদিন ধরে আর এস এস-এর স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

আর এস এস ছাড়া আর যে সকল সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠনাদি আছে, যথা ভারতীয় জনতা দল (বি জে পি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরংবলী দল, দুর্গা বাহিনী, সাধুমোহান্ত সাধ্বী সন্ন্যাসিনী ইত্যাদি, এরা সব প্রচারক ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা স্তরে নানা ভূমিকা পালন করার জন্য এদের সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি মহারাষ্ট্রের শিবসেনাকেও

প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য আপাতত সংঘ পরিবারে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। আর এস এস সংঘ সঞ্চালক বালাসাহেব দেওরস এবং শিবসেনার অধিনায়ক বাল ঠাকরে তুজনেই মারাঠি, কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে তুজনের মধ্যে একেবারে আশমান জমিন ফারাক। বাল ঠাকরে স্বার্থপর ও সংকীর্ণচেতা। বালাসাহেব দেওরস সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির উপরে উঠে এক বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির উপায় ভাবেন। তিনি এক রাষ্ট্র সংগঠক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকা উচিত নয়। তিনি বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হিন্দুর ত্রেতাযুগের গৌরবকেই আজকের ভারতে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেন, এই স্বপ্নকে তাঁর সত্য বলেই বিশ্বাস হয়। এবং সেই কারণেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ভারত হিন্দুর পবিত্র ভূমি এবং সেকুলার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এবং সেকুলার গণতন্ত্রবাদকে ভারত থেকে উন্মূল করার লড়াইয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং এর জন্য যে-কোনও আত্মত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত। তিনি বিশ্বাস করেন হিন্দুরাই ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারে। অবশ্যই সেই ভারত হিন্দুর ভারত। এবং এই হিন্দুর ভারত প্রতিষ্ঠা কারণে কোনও বলিদানই যথেষ্ট নয়, এমন কি আত্মবলিদানও ব্যর্থ নয়। তাঁর কাছে কোনও মিথ্যাচার তাই পাপ নয়।

সেকুলার গণতন্ত্রবাদী শিবিরের বন্ধুগণ। আপনারা এই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছেন আজ। আপনারাও কি আপনাদের আদর্শ রক্ষার জন্য আত্মবলিদানে প্রস্তুত? যদি প্রস্তুত তবে তার প্রস্তুতি কোথায়? আজ তবে সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরে সংহতি নেই কেন? কেন কোনও ঐক্যবদ্ধ শক্তি তবে আমরা গড়ে তুলতে পারছি না? এই প্রশ্ন আমাদের মনে তীব্র হয়ে আজও কেন উঠছে না? কেন এই ভাবনায় আমরা অস্থির হয়ে উঠছি না যে, এই সংগ্রাম ভারতে সেকুলার গণতন্ত্রেরই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম? কেন বুঝতে পারছি না যে এই সংগ্রাম শুধু মুসলমানদের বা অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখবার সংগ্রামই নয়, ভারতের প্রতিষ্ঠিত সেকুলার গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকেই বাঁচিয়ে রাখবার সংগ্রামও?

বিশ্বহিন্দু পরিষদের উচ্চনাদী প্রচারের কল্যাণে ভারতের হিন্দুরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, ভারতে হিন্দু মন্দির যা কিছু ভাঙা হয়েছে, সে সব ভেঙেছে মুসলমানেরাই। গজনীর সুলতান মামুদই হোন আর বাবরই হোন কিংবা বাদশা আলমগীরই হোন, হিন্দুর মন্দির এরাই ভেঙেছেন। বর্গিদের নেতা মারাঠি ব্রাহ্মণ ভাস্কর পণ্ডিতের নাম সংঘ পরিবার একবারও উচ্চারণ করেন না। বর্গিরা ওড়িশা এবং বাংলার ধনরত্ন বার বার লুণ্ঠন করতে এসে, ঠিক যে কারণে গজনীর সুলতান মামুদ বার বার ভারতে হানা মেরেছিলেন, সেই কারণেই ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে ওড়িশা এবং বাংলার কত মন্দির যে ভেঙেছে তার হিসেব নেই। এই ইতিহাস তো বেশি দিনের পুরনো নয়। এখনও যে কোনও লোক বীরভূম বর্ধমান নদীয়া হুগলিতে গেলে এই সব কালা পাহাড়ি নিদর্শন ভুরি ভুরি প্রত্যক্ষ করতে পারেন—যার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে সমসাময়িক কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামক গাথায়। আর এর বিবরণ আছে আধুনিক কালে মহাশ্বেতার রচিত 'শ্যাঁধারমানিক' উপন্যাসে।

কিন্তু আমাদের অত দূরে যাবারই বা কি দরকার? হাতের কাছেই তো পড়ে আছে কয়েকটা হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনা। না, পাকিস্তানে নয়, বাংলাদেশ নয়। এই ভারতেই হিন্দু মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। না না, কাশ্মীরে নয়। অযোধ্যায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কিছু দিন আগেই এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অযোধ্যার যে মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে তার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে সংকটমোচন মন্দির। এই মন্দিরটা অযোধ্যার একটা অবশ্য দ্রষ্টব্য ছিল। এই মন্দিরে ভক্তরা অনেক দিন ধরেই পূজা দিয়ে আসছিলেন। এই সব মন্দির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলেও, লক্ষ করা বিষয়, এ নিয়ে হিন্দু মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। মন্দিরের মোহান্ত মহারাজদের কয়েকজন প্রথম দিকে প্রতিবাদ করলেও তাঁদের কণ্ঠ রাম মন্দিরের জয় গানে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের 'সেকুলার মহলে', এমন কি সংবাদ মাধ্যমেও, ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুত্ব পায়নি। ব্যক্তিগত অধিকারকে আমরা গুরুত্ব দিই না। গোটা সংঘ পরিবার এ ব্যাপারে টুঁ শব্দ করেনি। কারণ? এই ঐতিহ্যসম্পন্ন মন্দির বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিজে ভেঙেছে। রামের কাল্পনিক জন্মস্থানে মন্দির তৈরির জন্য বাস্তবের সংকটমোচন মন্দিরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তার আগে ছলে বলে কৌশলে সংকটমোচন ও সন্নিহিত আরও কয়েকটা মন্দিরের ছবি আত্মসাৎ করা হয়েছে। কখনও টাকার লোভ দেখিয়ে, কখনও হুমকি দিয়ে মন্দিরগুলোর স্বত্ব গাফ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সাত তাড়াতাড়ি জমির দখল নেবার জন্য বুলডোজার চালিয়ে সংকটমোচন হনুমানগড়ি মন্দিরাদিকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে।

রাম মন্দিরের চত্বর প্রশস্ত করার জন্য এই সব মন্দিরের জমির দরকার পড়েছিল।

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসে। যথা: মন্দির ভাঙা অপরাধ কিনা? মন্দির, যে কোনও মন্দির, ভাঙলেই হিন্দু ধর্মে আঘাত দেওয়া হয় কি না? প্রতিষ্ঠিত মন্দির, যেখানে নিত্য পূজাপাঠ চলে, তা ছোট হোক আর বড় হোক, কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই মন্দির ভাঙা চলে কিনা? যদি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নির্দেশে সেই মন্দির ভাঙা হয় তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু মনে আঘাত করেছে এবং হিন্দু ধর্মের কাছে জঘন্য অপরাধ করেছে, এই অভিযোগ আনা যায় কি না? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার। উত্তর প্রদেশের বি জে পি সরকার, যার মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ, শুধু যে বাবরি মসজিদ রক্ষা করতে পারেনি তাই নয়, অযোধ্যার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মন্দিরগুলোও রক্ষা করতে পারেনি। কল্যাণ সিংহের সরকার এই হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংসের ব্যাপারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে হাতও মিলিয়েছিল।

তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না যে, সংঘ পরিবারের কাছে হিন্দু মন্দির রক্ষা করাটা নিছক একটা বাহানা মাত্র? তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য? এই প্রশ্ন কি তোলা যায় না যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংঘ পরিবার হিন্দু মন্দির ভাঙতে পারে? হ্যাঁ, সংঘ পরিবারের কাছে রাম যেমন উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়, তেমনই হিন্দু মন্দির সম্পর্কে মায়া কান্না তোলাও উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র।

এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রথম সোপানে আছে, হিন্দু আবেগকে উথলে দিয়ে হিন্দু মনে, অর্থাৎ মেজরিটি সম্প্রদায়ের মনে এমন এক তীব্র ঘৃণার আবহ সৃষ্টি করা যাতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মন থেকে যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অন্ধ আবেগই হচ্ছে সংঘ পরিবারের হাতে তুরুপের টেক্কা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', টিলকের 'গণপতি উৎসব', 'শিবাজী উৎসব' ইত্যাদি ভাবধারাকেই আমরা জাতীয় ভাবধারা বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। এই জাতীয়তাবাদী প্রবাহই নাকি ভারতীয় জীবনের, তার সংস্কৃতির, মূল প্রবাহ। এরই সঙ্গে মিশে যাওয়াটাই ভারতীয়ত্ব। এই কথা জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা বার বার আমাদের শুনিয়ে এসেছেন। ভাবের বন্যায় ভেসে গিয়ে তাঁরা এর অন্তর্নিহিত সর্বনাশটা আঁচ করতে পারেন নি। অনেকান্তবাদী হিন্দুর মনকে জাতীয়তার এই একান্তবাদী প্রবাহের খাতে চালিত করার যে সূচনা জাতীয় আন্দোলনে হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাই ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে মুসলিম বিদ্বেষে রূপ পরিগ্রহ করে।

এটাকেই বলা হয় জাতীয়তাবাদী ধারা। এই জাতীয়তাবাদী ধারাকে একটু বোঝা দরকার। এটা এমনই এক ছদ্মবেশী সর্বনাশ যে, মানবিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথের মনকেও এক সময় প্রভাবিত করে তুলেছিল। বাংলায় শিবজী উৎসবের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সরলা দেবী আর সুরেন ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ শিবজী উৎসব নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। কারণ তখন এটাই ছিল জাতীয়তাবাদী ধারা। রবীন্দ্রনাথের ভুল বুঝতে দেরি হয়নি। তাঁর জ্ঞাশনালিজম্ গ্রন্থই তার সাক্ষী। জ্ঞাশনালিজমে কী সর্বনাশ লুকিয়ে আছে সেটা আর বুঝেছিলেন মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায়। মানবেন্দ্র নাথ জ্ঞাশনালিজম্‌কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, জ্ঞাশনালিজম্ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ আজকের যুগে অচল, ওটা বাতিল মতাদর্শ।

ভারতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আজ হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হতে বাধ্য। সংঘ পরিবার বলছেন, ভারতে জাতীয়তাবাদ মানেই হিন্দুত্ববাদ। তাঁরা ঠিকই বলছেন। দামোদর বিনায়ক সাভারকর বলেছিলেন, 'রাজনীতিকে হিন্দুত্ববাদে নিয়ে যাও, আর হিন্দুত্বকে জঙ্গিবাদী করে তোল।' সাভারকরের সেই স্বপ্ন অর্থাৎ জঙ্গি হিন্দুত্ববাদকেই সংঘ পরিবার আজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছে। আর আমরা সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃবৃন্দের মুখে অহরহ শুনছি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এবং জাতীয়তাবাদ। আমাদের জাতীয়তাবাদী প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ঠিক এই জিনিসই সংঘ পরিবার চাইছে। তাহলে?

এই দুই শিবিরে পার্থক্য থাকল কোথায়? একই হাটে যদি আমরা একই মাল বেচতে যাই, তখনই না আসল নকলের চক্করে পড়ে যাবার আশঙ্কা জেগে উঠবে? ভাবের ঘরে চুরি করলে এই গাড্ডায় পড়তে হয়। প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি জাতীয়তাবাদী হতে চাই? আমরা কি 'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান'—এই জাতীয়তাবাদী উচ্চারণকে আমাদের কণ্ঠে তুলে নিতে চাই? এটাকে সাম্প্রদায়িক উচ্চারণ বলে ভেবে নিয়ে অবহেলা করবেন না। ভারতে জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিলে জাতীয়তা আর সাম্প্রদায়িকতা এই সঙ্গমে এসেই মিলবে। 'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান'—এই ধ্বনি সাম্প্রদায়িকতাবাদের যেমন, আবার তেমনই জাতীয়তাবাদেরও।

জিজ্ঞাসা করুন, জাতীয়তাবাদও কি একাত্মবাদী মতাদর্শ নয়? এবং ওই মতাদর্শ কি আমার?

ভারতের বাণী যদি হয় বহুজনের হিত, জন্মি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদে কি সেই হিত পাওয়া যাবে?

ভারতের বাণী যদি হয়, বিবিধের মাঝে মহান মিলন, জন্মি হিন্দুত্ববাদ কি সেই মিলন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? ভারতে সংহতি রক্ষা করতে কি পারবে?

আজকের জাতীয়তাবাদ জন্মি জাতীয়তাবাদ হতে বাধ্য। এবং জন্মি জাতীয়তাবাদই ফ্যাসিবাদ। এবং জন্মি জাতীয়তাবাদে গণতন্ত্রের সর্বনাশ।

না, আমরা জাতীয়তাবাদ চাই না। আমরা ভারতে এক ছাঁচে গড়া সমাজ চাই না। আমরা চাই কস্‌মোপলিট্যান সমাজ। আজকের বিশ্বের গতি সেই দিকে। আমরা এমন সমাজ চাই, যে সমাজ বিশ্বাস করে যে, যত মত তত পথ। একেই বলে অনেকান্তবাদী সমাজ। যে যার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সেই সমাজে সৃজনশীল জীবন যাপন করবে, আমরা এমন সমাজই চাই। এবং সে সমাজ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে আছে এক বিমূর্ত ধারণা—যা নানা রূপে, যথা কখনও দেশ, কখনও জাতি, কখনও বা কোনও বিশেষ মতাদর্শ, এ সবের ভেক ধরে আমাদের সামনে আসে। মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কস্‌মোপলিট্যান চেতনা এই একেবারে বিপরীত মেরুতে। মানুষ, রক্ত মাংসের মানুষই সে চেতনার মূল বিন্দু। কস্‌মোপলিট্যান সমাজ ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতিকে কোনও কেন্দ্রীয় জাঁতাকলে পেষাই হতে দেয় না। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সে সমাজ যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করে তাকেই আমরা মানুষের উত্তরাধিকার বলি। জাতীয়তাবাদ দিয়ে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ জন্মি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। তাই তার ধ্বনি হচ্ছে, ইউনিটি অ্যাণ্ড মিলিট্যান্‌সি, অর্থাৎ ঐক্য এবং জঙ্গিত্ব। জঙ্গিত্ব দিয়ে যে ঐক্য গড়ে তোলা হয় তা হল জবরদস্তির ঐক্য। এই জন্মি মনোভাব, এটাই হল ফ্যাসিবাদ।

(৫)

এবার সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের মুণ্ডগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক। এই শিবিরের অগ্রসেনা হল কংগ্রেস। কংগ্রেস সেকুলার গণতন্ত্রবাদী ঐতিহ্যকে এখনও ধরে রেখেছে। যদিও সেই ঐতিহ্য কিছুটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। এখন কংগ্রেসের স্লোগান কী? জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য আর জাতীয়তাবাদী ঐক্য কি এক জিনিস? এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠা উচিত, জাতীয় ঐক্য আর জাতীয়তাবাদী ঐক্য, এ দুটো কি আলাদা বস্তু? হাঁ, কথা দুটো শুনতে এক হলেও দুটো আলাদা বস্তুই বটে। জাতীয় ঐক্যের জন্ম হয় জাতীয়বোধ থেকে। দেশকে আমি ভালোবাসি। এই মনোভাবের মধ্যে জাতীয়বোধকে পাওয়া যায়। এর ভিত্তি ভালবাসা। কিন্তু যখন বলি, 'গরব্ সে কহো হাম হিন্দু হ্যায়' তখন তার পিছনে থাকে অহংকার। এই যে অহংকৃত উচ্চারণ সেটাই জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রতিফলন। অহঙ্কার ছাড়া জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না। 'মাই কান্‌ট্রি, রাইট্ অর রং'—এই গোঁড়ামিই জাতীয়তাবাদের দাঁড়াবার প্রকৃষ্ট জায়গা। ধর্মীয় মৌলবাদও ওই একই অহমিকার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। 'মাই রিলিজিয়ন, রাইট্ অর রং।' এবং এই অহমিকাই অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা জাগিয়ে তোলার উস্‌কানি দেয় এবং সংঘর্ষের দরজা খুলে দেয়। মিত্রতা নয়, জাতীয়তাবাদ দাঁড়িয়ে থাকে বৈরিতার উপরে। জাতীয়তাবাদ মানুষে মানুষে সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাও এই একই কারণে মানুষে মানুষে সেতু বাঁধতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবুও কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ চায়। কংগ্রেস একদিকে সেকুলারিজম্ এবং গণতন্ত্র চায় আবার আর এক মুখে জাতীয়তাবাদ চায়। জাতীয়তাবাদের প্রবাহকেই ভারতের জীবনযাত্রার মূল স্রোত বলে স্বীকার করে। সংঘ পরিবারও জাতীয়তাবাদী ধারাকে ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল ধারা বলে স্বীকার করে। সংঘ পরিবার বলে, ভারতের জাতীয়তাবাদী ধারাই হিন্দুত্ব, কারণ হিন্দুরাই ভারতে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী। নেশনের সংজ্ঞা এই রকম: 'কন্‌সিডারেব্‌ল্ গ্রুপ অফ্ পিপ্‌ল্ হ্যাভিং কমন্ ডিসেন্ট্, হিস্টোরি, অর্ ল্যাংগোয়েজ্।' নেশনের এই সংজ্ঞা সংঘ পরিবারের দাবিকে যত জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তেমন ভাবে কংগ্রেসের দাবিকে তুলে ধরতে পারে না।

সেকুলার গণতন্ত্রবাদী শিবিরের কর্ণধারগণ বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বুঝতে চেষ্টা করবেন কি?

ভারতে যে সকল মনুষ্য গোষ্ঠী আবহমান কাল ধরে বসবাস করছে তাদের সবাই এক বংশোদ্ভব নয়। মনুষ্য গোষ্ঠীর নানা ধারা ভারতে এসে মিলিত হয়েছে।

ভারতে যে সকল মনুষ্য গোষ্ঠী আবহমান কাল ধরে বসবাস করছে তাদের ইতিহাস এক নয়। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীরই পৃথক ইতিহাস আছে।

ভারতে যে সকল মনুষ্য গোষ্ঠী আবহমান কাল ধরে বসবাস করছে তাদের ভাষা এক নয়। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে।

আর এই নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ভারতের সমন্বিত সংস্কৃতি। এক নয়, যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের ধারা এই সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে। এইটেই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এইটেই ভারতের গৌরব।

কোন্ গোষ্ঠীর জীবন ধারাকে তাহলে ভারতের জনজীবনের মূল প্রবাহ হিসাবে সনাক্ত করা যাবে?

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। যত মত তত পথ। ভারতের বাণী এইটে। 'ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন ঘটাইতে হইবে', রবীন্দ্রনাথেরও উপলব্ধি তাই।

'সোসাইটি ইউনাইটেড্ আন্‌ডার ওয়ান গভর্ণমেন্ট্ ইন্ এ পলিটিক্যাল স্টেট'—মানবেন্দ্রনাথ নেশনের এই সংজ্ঞার মধ্যে সর্বনাশের গন্ধ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতকে নেশন হিসাবে স্বীকার করেননি, তিনি বলেছিলেন ভারততীর্থ। তিনি দেখেছিলেন, ভারতকে নেশনের অ্যাটম্যাট পরিধির মধ্যে ফেলা যায় না। ভারতের সাধনা সমন্বিত সংস্কৃতির সাধনা। ভারত এক জাতি নয়, বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। এই কথাটি সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। যদি আমরা এই কথাটি স্মরণ রাখতে পারি, তবেই আমরা ভারতের কস্‌মোপলিট্যান চরিত্র বজায় রাখতে পারব, ভারতের বিশ্বমানবিক চরিত্রটি রক্ষা করতে পারব। একে যত পুষ্ট করতে পারব, একে যত ছাড়িয়ে দিতে পারব, সেই পরিমাণেই আমরা সংঘ পরিবারের আক্রমণকে ঠেকিয়ে দিতে সমর্থ হব। ভারতে সংঘ পরিবারের আক্রমণ আসবে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পিঠে চড়ে।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন সেটা সেকুলার গণতান্ত্রিক শিবিরের স্মরণ রাখা উচিত বলে মনে করি। মানবেন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মর্ম কথা এই: আর এস এস আর হিন্দু মহাসভা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুয়াকে উচ্চ নাদে তুলে একদিন কংগ্রেসের জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। আজকের বাস্তব প্রমাণ করেছে মানবেন্দ্রনাথের সতর্কবাণী কত সত্য। আজ অবশ্য হিন্দু মহাসভা দল বিগতপ্রভ। কিন্তু হিন্দু মহাসভা বিলুপ্ত হয়নি, আজ সে বহুরূপে সম্মুখে তোমার। সে নবজন্ম লাভ করেছে ভারতীয় জনতা দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি নানা ধরনের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মধ্যে।

তাহলে আজও কি আমরা জাতীয়তাবাদকে ভারতের রাজনীতির মূল প্রবাহ বলে আঁকড়ে থাকব? এবং পরিশেষে সংঘ পরিবারের গহ্বরে গিয়ে পড়বার মতো ঘোরতর মূর্খামি করে বসব?

মনে রাখতে হবে, যে লড়াই আজ সংঘ পরিবার প্রকাশ্যে শুরু করেছে ভাবের ঘরে চুরি করে সে লড়াইতে জেতা যাবে না। সেকুলার গণতন্ত্রের মতাদর্শকে যদি আমাদের রক্ষা করতে হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে। সেকুলার গণতন্ত্র বাইরের কাঠামো। তার পাদপীঠ হচ্ছে কস্‌মোপলিট্যান বা বিশ্বমানবিক ভাবধারা, তার আত্মা হচ্ছে সমন্বিত সংস্কৃতি। ভারতের মর্মবাণীও তাই। জাতীয়তা নয়, মানবিকতা, এই হবে আমাদের উচ্চারণ।

সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী আক্রমণের মুখে পড়ে আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বামপন্থীদের মধ্যেও দেখি জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে ভিড়ে যাবার জন্য 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি হুড়োহুড়ি' পড়ে গিয়েছে। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী জনতা দল ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সম্প্রদায়বাদ থেকে শুরু করে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অনুশীলন ভারতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, পরিণামে ভারত বিভক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের 'ডিভাইড্ অ্যান্ড্ রুল' নীতি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এই আপাত মনোহর অসার উক্তিটি বারংবার উচ্চারণ করে আমরা নিজেদের ব্যর্থতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছি। তাই এই বিভেদের মূল কারণ যে আমাদের মধ্যেই নিহিত, এই সত্য স্বীকার করার মতো সাহস আমরা আজও সঞ্চয় করতে পারিনি। স্বচ্ছ চিন্তার দ্বারাই সত্যকে জানা যায়। চিন্তার ক্ষেত্রে যারা দেউলিয়া তাদের দুর্গতি কে মোচন করবে?

আমাদের দুর্গতি যদি মোচন করতে হয় তবে এই সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুরাই আমাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছে। এ কথা বলতে হবে যে, হিন্দু সমাজ ভেদ নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণদের ছকে দেওয়া

এই সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ না ঘটলে ভারতে কসমোপলিটান বা বিশ্বমানবিক ভাবধারার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার সম্ভবই নয়। জনমনে কস্‌মোপলিটান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ এবং প্রসার ক্রমাগত না ঘটাতে পারলে সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবই নয়। সংঘ পরিবারের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র কি জাতপাতের ভেদনীতির উপর স্থাপিত এই হিন্দু সমাজ বজায় রাখতে চায়? না, আধুনিক ভারতে বহুজনের হিতের স্বার্থে এই হিন্দু সমাজকে ভাঙতে চায়? না, তারা এই সংকীর্ণ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙতে চায় না। মানুষের মূল্যে মানুষকে গ্রহণ করো, আধুনিক বিশ্বের এই বাণী গ্রহণ করতে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র অস্বীকার করে। কারণ তার সমাজ ব্যবস্থাই টিঁকে আছে জাতপাতের ভেদনীতির উপরে। সংঘ পরিবারের হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্নে মস্ত দুর্বলতা এইখানে। এই দুর্বলতা তারা ঢাকতে চায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চারে বিদ্বেষ ছড়িয়ে।

সংঘ পরিবারের এই রণনীতিকে যদি পরাস্ত করতে হয় তবে সজোরে ঘা মারতে হবে এইখানে, তার দুর্বলতম স্থানে। হিন্দু সমাজই হল সংঘ পরিবারের দুর্বলতম স্থান। কে সেখানে আঘাত হানতে চান?

হদিশ মেলে না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পৃথিবীটা নাকি
তিন-ভাগ জল আর
এক-ভাগ ডাঙা।

অধুনা এখানে
এক-ভাগ ডাঙা আর
দশ-ভাগ জল।

এখানে বুকের কাছে
এখানে মাথার কাছে
ভেঙে পড়ে ঢেউ।

দেখে মনে হয়
নব্বই-ভাগ জল আর
এক-ভাগ ডাঙা।

এখানে দেয় না সাড়া কেউ
ইদানীং যে যতই ডাকে।
যেন কেউ নয় কারও চেনা।

এখানে কপালগুলো ভাঙা।
যতই সাঁতার কাটি, এখানে ডাঙার
হদিশ মেলে না।

কবিতার ভবিষ্যৎ

হরপ্রসাদ মিত্র

বোধ হয় কালের এ ঘোর তমসা
মানবজগতে আরো বাড়বেই,
বোধ হয় ঝাপসা ছায়ামূর্তিরা
আরো স্থূলতর চেহারা হবেই।

যে-সকল অনুভবের অমৃতে
হৃৎপারিজাতে সুরভি শোভা
পেয়েছিল মন মৃৎসুষমায়
হৃতগৌরব হবেই তারা।

সহজ প্রাণের উল্লাসে শোকে
অবাক বোধে বা সরল প্রেমে
একালে কাঁপেনা স্নায়ুতন্তুরা,
কবিতার নদী যাবে কি থেমে ?

বোধ হয় ভাষার চমক-গমক
উতলা আবেশ, মায়ার খেলা—
ধ্বনির মোহিনী স্রোতস্বিনীর
লীলাভঙ্গির ফুরোয় বেলা।

দুপুরে দমকা হাওয়া এলো যেই
দোলালো কৃষ্ণচূড়ার শাখা,
গুরু গুরু মেঘ ডাকলো এবং
বৃষ্টিও হোলো কয়েক ফোঁটা।
কিন্তু তাতে কি ? প্রাণে অবসাদ,
ধরণীর মাটি ভেজেনি মোটে,
ভেতরে-ভেতরে অসীম জড়তা—
সকলেই ভোগে অবিশ্বাসে।

ওজোন-চাঁদোয়া ফুটো হয়ে গেছে
কুমেরু-শিয়রে ঊর্ধ্বাকাশে—
গামা রশ্মির বিনাশী আঘাতে
দম স্বভাবত ফুরিয়ে আসে।

নস্ট্রাডেমাস কোষ্ঠী বানিয়ে
দেখেছেন ঘোর জলোচ্ছ্বাসে
বাংলার এই বদ্বীপ ডুববে।
—১৪০০ সালে কি হবে তবে ?

বেহাগ

রাজলক্ষ্মী দেবী

চৈত্রমাসে সন্ধ্যাভাসে কেন বাজাও
শান্ত ইমন, ক্লান্ত পূরবী ?
রক্তসীঁথি—সন্ধ্যা দেখো মোছে নি তা-ও,
হৃদয়সুরা থিতিয়ে সুরভি।

সান্ত্বনা-র বাঁধাঘাটে তো অথই জল,
হৃদয় তবু আগুনবরণী।
সর্বনাশী যমুনা যেই হয় উছল
ধায় সে বৃথা কলসভরণে।

বৃন্তে আর ফেরে না উড়ে মনপাখি,
সমুদ্রের সমাধি পাবে সে ;
ঝাউয়ের পাতা চেনে হাওয়ার বৈশাখী !
শতচ্ছিন্ন ভাবের আবেশে।

ইন্দ্রধনু আকাশে জাগে, খনিতে হীরা,
হৃদয়তলে স্মৃতিটি জাগরূক।
দিন ফুরালে প্রদীপ জ্বালে চকমকি-বা—
অন্ধকার পাতালে তার মুখ !

চৈত্রমাসে সন্ধ্যাভাসে রাগ বেহাগ।
তপ্ত এ মন, তপ্ত ধরণী।
সন্ধ্যার সীমন্তে, দেখো, রক্তরাগ ;
হৃদয় আজো আগুনবরণী।

আকাশময়

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

কাগজে নয়
রঙের বাহার
আকাশময়

টবেতে নয়
ফুলের বাগান আকাশময়

মাটিতে নয়
নীলের বুকে শুভ্র সুখে
মেঘের সাথে হাওয়ার প্রণয়
আকাশময়

রাত্রিদিন
যাত্রীহীন
সময় চলে
আপন কলে
দুই সারথি অস্ত-উদয়
আকাশময়

তুলি ও রং
তুলি বরং
বন্ধ চোখে
ইন্দ্রলোকে
ইন্দ্রধনু ছড়িয়ে রয়
আকাশময়

কাগজে নয়
মগজে নয়
সমস্ত রং আকাশময়
আকাশময়

ঈশ্বর, ধর্ম ও বিদ্যাসাগর

অমিয় কুমার সামন্ত

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ও ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে যে বিতর্ক তাঁর জীবদ্দশাতেই ধূমায়িত ছিল, মৃত্যুর পরেও সেই বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে এইরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সহজ একটি সর্বজনমান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে ওঠে। তথ্যের অপ্রতুলতা এই ব্যাপারে সর্বপ্রধান বাধা। বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে তাঁর রচনায় ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন। অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আদৌ আকর্ষণ করত না। আলাপ-আলোচনাতেও তিনি এই বিষয়ে স্বল্পবাক্ ছিলেন বলেই জানা যায়। তবুও, বিদ্যাসাগর মজলিশি মানুষ ছিলেন। তাঁর মেছুয়াবাজারের বাসায়, বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বসু স্ট্রীট) বাড়িতে কিংবা বাদুড় বাগানে তাঁর নিজের বাড়ির দোতলায় প্রায়ই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগমে আলোচনার আসর বসত। সমসাময়িকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গুরুতর বিষয়ের বিদগ্ধ আলোচনায় কিংবা সরস কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের সমতুল্য ব্যক্তি দুর্লভ ছিল। দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর দ্বারকানাথের যখন প্রস্থান করলেন তখন বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যকে বললেন, "এ কাকে এনেছিলে হে, এ চোখে মুখে কথা কয়, আমাকে থ করে দিল। আমি ত জানতাম যেখানে আমি সেখানে আর কেউ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়।"[২] কালক্রমে দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। দ্বারকানাথের বাড়িতে একদিন আলাপ আলোচনার পর বিদ্যাসাগর প্রস্থান করলে দ্বারকানাথ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের বললেন, "বাবা রে, এক giant! দেখলে কেমন বুদ্ধি-বিদ্যার দৌড়। মানুষটার যেমন heart তেমনি head।"[২] এই সব আলোচনার আসরে সমাজ রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদি অবশ্যই আলোচিত হত কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই আলোচনার কোনও বিবরণ কেউ লিখে রেখে যান নি। রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথচ সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।"[৩] নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক জীবনীকারদের এবং তাঁর পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর নির্ভর করতে হয় বেশি। তারাও আবার আপন আপন মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তবুও এই মতামতগুলি বিশেষ মূল্যবান, কারণ এগুলির বিস্তারিত এবং নিরপেক্ষ আলোচনার মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পরিধি এবং গভীরতার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯০২) বালক বয়স থেকে বিদ্যাসাগরকে চিনতেন—যৌবনে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। কৃষ্ণকমল দ্বিতীয়বার বিবাহ করাতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিছু দিন মনোমালিন্য হয়েছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা চিরদিনই অটুট ছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পরে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্মৃতিচারণের সময় কৃষ্ণকমল মন্তব্য করলেন, "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে কথা লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুজ্যের সহিত পরকাল-তত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন; ললিত সে সময় যেন কতকটা যোগ সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত।"[৪] কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার মধ্যে। তাঁর মতে "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের

সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রদের ধর্ম বিশ্বাস টলিল; চিরপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!" কৃষ্ণকমলের এই ব্যাখ্যা কিন্তু সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না; ডেভিড হেয়ারের স্কুলে পড়েন নি। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের বন্যায় নিজের বিশ্বাসকে ভাসিয়েও দেননি। তাঁর যুক্তিবাদী মনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আমাদের দেশেরই ক্লাসিকাল সাহিত্যে এবং পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে। তাঁর মানবমুখিতা এই দুই উৎস থেকেই আহরিত। কৃষ্ণকমল স্বয়ং অগুস্ত কোঁতের (Auguste Comte, 1798-1857) Positivist Philosophy বা ধ্রুব দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে সেকথা স্বীকার করে বলছেন, "আমি Positivist, আমি নাস্তিক।" কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব দুই ভায়ের উপর বড় সামান্য ছিল না।" সেই প্রভাব কোঁতের দর্শন পড়ার আগেই কৃষ্ণকমল ও তাঁর দাদার (তরুণ বয়সে এঁর মৃত্যু ঘটে) ধর্মমতকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ, "বোধহয় সতেরো-আঠারো বৎসর পর্যন্ত সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ এই সকল ধর্মানুষ্ঠানে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। পরে, ইংরাজী অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক ক্রমশ বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত হিন্দুধর্মে শৈথিল্য জন্মিল।"[৬]

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্পর্কে কৃষ্ণকমলের বক্তব্য প্রকাশিত হলে জনৈক পাঠক 'হিতবাদী' পত্রিকায় কৃষ্ণকমলের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। চিঠির উপরে বিদ্যাসাগর "শ্রীহরি শরণং" লিখতেন, সুতরাং তিনি নাস্তিক হতে পারেন না—এই ছিল কৃষ্ণকমলের মন্তব্য খণ্ডনের প্রধান যুক্তি। এর উত্তরে কৃষ্ণকমল বলেন "চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোকে নাস্তিক হয় কি না ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি যে কোনও কোনও সময় বিদ্যাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—'ঈশ্বর যদি থাকেন ত তিনি ত আর কামড়াবেন না।' একথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায়, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন"।[৭] কৃষ্ণকমল নিজে নাস্তিক ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণ করতে আগ্রহী ছিলেন এরকম অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্পর্কিত অল্প যে কয়েকটি মন্তব্য পাওয়া যায়, সেগুলি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাস প্রমাণ করে না। তা ছাড়া কৃষ্ণকমল স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে তাঁর বড়দাদার উপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব ছিল বেশি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬) রচিত বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগর চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিকট থেকে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ হাইকোর্টের রায়ে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পিতার সম্পত্তির অধিকার পাবার পর চিঠিপত্র ইত্যাদির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চণ্ডীচরণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে। সুতরাং চণ্ডীচরণের জীবনী লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অপ্রাচুর্য ছিল না। চণ্ডীচরণ নিজে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর গভীর ধর্মবিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস তাঁর চিন্তা ও বিচারকেও যে প্রভাবিত করেছিল এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে যে কোন মহৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এই বিশ্বাস তাঁর পূর্বসূরী ও কিছু কিছু সমসাময়িকদের মত তাঁরও ছিল। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় যে প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তার কারণ ব্যাখ্যা করে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রগত ধর্ম ব্যাখ্যা সম্মত হইয়াছিল। সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাহার সংস্কার ব্যাপার ধর্ম-সংস্কার প্রসূত হয় নাই বলিয়া বিশেষভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিল না"।[৮] চণ্ডীচরণের বক্তব্য, ধর্ম-সংস্কারের মধ্য দিয়েই সমাজ-সংস্কার হবে; কারণ ধর্মের ক্রমবর্ধমান জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের ফলেই সমাজ দেহেও কুসংস্কার এবং ক্ষয়িষ্ণুতা প্রকট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক মানসিকতাটি চণ্ডীচরণ সম্যক অনুধাবন করতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তিজীবনেও তেমনি বিদ্যাসাগর ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখবেন এ কথা মেনে নিতে ধার্মিক চণ্ডীচরণ সম্মত ছিলেন না। বিদ্যাসাগরকে ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করলে তাঁকে অশ্রদ্ধেয় করা হবে এইরূপ একটা ধারণাও চণ্ডীচরণকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি লিখছেন, "অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগরের কোনও ধর্ম বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত

কথাবার্তা কহিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আচার-আচরণে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনও এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকল্প সম্পন্ন হিন্দুর অনুরূপ ছিল না; অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।"[৯] চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরকে ধর্ম বিশ্বাসী প্রমাণ করার জন্য 'বোধোদয়' নামক স্কুল পাঠ্য একটি বইয়ে 'ঈশ্বর' শিরোনামে একটি রচনার উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের উপর কোনও লেখাই 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী 'বোধোদয়' প্রকাশের পর বিদ্যাসাগরকে বলেন, "অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে কোনও কথা নাই কেন?"[১০] পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরের কথা থাকবে বলে বিদ্যাসাগর আশ্বাস দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রবন্ধ 'পদার্থের' পরেই 'ঈশ্বর' শিরোনামে একটি ছোট লেখা সংযোজিত হয়। চণ্ডীচরণের মতে, "নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহার মতো শিক্ষার সুহৃদ বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরবোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না।" দ্বিতীয় সংস্করণ বোধোদয়ে 'ঈশ্বর' প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য ছিল, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।" ঈশ্বরের এই সংজ্ঞা বালকের বোধশক্তির পক্ষে এতই দুরূহ যে পরে এই বাক্যটিকে পরিবর্তন করে ঈশ্বরকে পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণনা করতে হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বোধোদয়ে ঈশ্বর স্থান পেলেন বিদ্যাসাগরের স্ব ইচ্ছায় বা তাঁর অন্তরের প্রেরণায় নয়, বন্ধুর অনুরোধে। কালক্রমে, জনমতের চাপেই ঈশ্বরের বিবর্তন ঘটল। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম থেকে জীব ও পদার্থের সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখা দিলেন। গভীর, মানসিক ও আত্মমর্যাদা বোধের প্রয়োজন ছাড়া প্রচলিত নিয়ম ও বিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়ে সংঘাত সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ছিল না। বস্তুত পক্ষে তাঁর প্রখর বাস্তববোধ ছিল বলে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারতেন। যাই হোক, 'ঈশ্বর' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির সংযোজন বিদ্যাসাগরের "ধর্মবিশ্বাস" প্রকাশ না করলেও এটি যে সাধারণ মানুষের মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ রেখেই সংযোজিত হয়েছিল তাতে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। চিঠিপত্রের উপর "শ্রী হরি শরণং" ইত্যাদি পাঠ লেখার প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "তিনি কেবল মাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোনও কাজই করিতেন না। যাহা নিজ হৃদয়ের অনুমোদিত তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।"[১১] এই বক্তব্যের সঙ্গে চণ্ডীচরণের নিয়ে উদ্ধৃত তথ্যটির কিছু অসঙ্গতি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। চণ্ডীচরণ লিখছেন, "গোস্বামী মহাশয় বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাস বিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিজের ধর্মমত বা বিশ্বাস দেখাইতে বা জানিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মমত বা বিশ্বাস সর্বদাই গোপন করিয়া চলিতেন।"[১২] পত্রশীর্ষে "শ্রীশ্রী হরি" লেখা ধর্ম বিশ্বাস প্রচারের প্রমাণ বলে কোনক্রমেই মনে করা যায় না।

বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১) চণ্ডীচরণের সমসাময়িক হলেও তিনি বিদ্যাসাগরের পরিচিত ছিলেন না; কিংবা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর উপর বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনার দায়িত্বও অর্পণ করেন নি। তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার প্রেরণায় প্রচুর পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "বিদ্যাসাগর পুস্তকের বিষয় সংগ্রহে যে রূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তেমন গুরুতর পরিশ্রম জীবনে আর কখনও করি নাই।"[১৩] বিহারীলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, বিদ্যাসাগরের হিন্দু-সমাজের কুসংস্কারগুলির সংস্কার প্রচেষ্টা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিহারীলালের মতে বিদ্যাসাগর "ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে" বিধবা-বিবাহ-রূপ, "অকীর্তিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন," কারণ "কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর আত্মসংযমে সমর্থ হন নাই"। বিহারীলালের সিদ্ধান্ত, "ইহা তাঁহার দোষ নহে, দোষ তাঁহার শিক্ষার। হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। হিন্দু সমাজের গঠনের মূল তত্ত্ব এই জন্য তিনি লক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন না"।[১৪] তা সত্ত্বেও বিহারীলাল বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলতে পারেন নি, যদিও তাঁর অহিন্দু জনোচিত কাজকর্মের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। বিদ্যাসাগরের চিকিৎসক ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশে নিয়ম ছিল পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই-একবার মন্ত্র দিবার প্রস্তাব দিয়া সুবিধা করিতে পারেন নাই। সুতরাং

তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর 'বিবেচনা করিয়া লইব' বলিয়া স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করিলে বিদ্যাসাগর মন্ত্রগ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্র গ্রহণে বিদ্যাসাগরের মত নাই বুঝিয়া পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই।"[১৫] ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও "তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক দেখিয়া তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন না। আপন পরিবারের মধ্যে তৎসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল না।" বিহারীলালের এই সমস্ত তথ্যের দ্বারা বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা প্রমাণিত হয় না, যদিও তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ক্ষুব্ধ বিহারীলাল সোজাসুজি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক না বললেও, তিনি হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেননি বলে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম"-এর অনুবাদে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে কণ্বের তপঃপ্রভাবে দেব-প্রদত্ত অলংকারে সজ্জিত হওয়ার অলৌকিক কাহিনী বর্জন করেছেন। বিহারীলালের মতে, "ঋষিশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?"[১৬] বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে দেবসেবার জন্য কোনও অর্থসংস্থান করে যান নি। বিহারীলালের মতে "উহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয়।"[১৭] বিহারীলাল ঘোরতর হিন্দু, তিনি বিদ্যাসাগরের সমস্ত বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে ধর্মীয় মতামত ও আচার-নিষ্ঠা পালনে তাঁর ঔদার্যেরও উল্লেখ করেছেন। ধর্মের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর অনেক কথাবার্তা কহিলেন। শেষে একটু ধর্ম্মের তর্ক সহসা আসিয়া পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, দেখ, ধর্ম কর্ম ও সব দল বাঁধা কাণ্ড, এই দেখ মনুর একটি শ্লোক ঃ—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়ং সতাংমার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি ॥
(মনু সংহিতা।)

পিতা-পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া সেই পথে চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না। কেন বাপু, সৎপথেই যদি চলিবে তবে আবার পিতা-পিতামহ কেন? দুই পথ না বলিলে দল রক্ষা হয় না, এই না? পাছে অপরের, অপর জাতির সৎপথে লোক যায়, দল ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্যই না মনুঠাকুরের এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। তাই বলি, ধর্ম কর্ম ওসব দল বাঁধা কাণ্ড।"[১৮] হিন্দু ধর্ম পূর্বস্থরীদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্মে ও সমাজে যে অচলায়তন গড়ে উঠেছে, যা প্রবহমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, সেই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের গভীর অন্তর্দৃষ্টির উদাহরণ এই বক্তব্যটি।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের "বিদ্যাসাগর জীবন চরিত" বস্তুত পক্ষে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় এবং এটিই বিদ্যাসাগরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ঘটনার বিবরণ এই জীবনীতে পাওয়া গেলেও, আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি ছিল। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণ থেকেই জানা যায় যে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে ঈশ্বরচন্দ্র গায়ত্রী মন্ত্র ভুলে গিয়ে, ঠাকুরদাসকে ফাঁকি দিতে, গঙ্গা স্নানের পর ঠোঁট নেড়ে যে মন্ত্র পাঠের ভান করছিলেন তা আদৌ গায়ত্রী নয়। ধরা পড়ে অবশ্য পিতার নিকট উপযুক্ত প্রহার লাভ হয়েছিল।[১৯] অতএব ঈশ্বরচন্দ্র বালক কাল থেকেই ধর্ম ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে উদাসীন ও নিস্পৃহ। ঠাকুরদাস কিন্তু ধর্ম-আচরণে নিষ্ঠাবান এবং গভীর ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। বিদ্যাসাগরও পিতার অনুরক্ত এবং পিতৃভক্তিতে কারুর থেকে ন্যূন ছিলেন না। তবুও পিতার থেকে বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর মাতার ও পিতামহের প্রভাব ছিল বেশি। ঋজু চরিত্রের পথিক এই মানুষটি বিদ্যাসাগরের ভাষায় "নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন"। ভগবতী দেবী প্রতিবেশী গ্রামবাসীর প্রতি মমতায়, দরিদ্রের সেবায়, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যায় বিদ্যাসাগরের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস বাস্তবতা বোধের দ্বারা পরিচালিত। গ্রামের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার অযথা আড়ম্বর না করে সেই টাকায় দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোতে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। তীর্থ ও তীর্থবাস না করে গ্রামের গরিব মানুষের সেবা তাঁর কাছে অনেক আকর্ষণীয় ছিল। তিনি ঠাকুরদাসকে তীর্থবাসের জন্য মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন। ধর্ম ও ঈশ্বরে ভগবতী দেবীর বিশ্বাস বিশেষ গভীর ছিল বলে মনে হয় না।

বিদ্যাসাগরের উপর ভগবতী দেবীর প্রভাব যত বেশি ছিল ঠাকুরদাসের প্রভাব ততটা ছিল না। বিদ্যাসাগর ১৮৪১

সালে তাঁর প্রথম তীর্থযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করেছিলেন তাঁর স্কলারশিপের টাকা থেকে। ১৮৪২ সাল থেকে ঠাকুরদাস চাকুরি ছেড়ে বীরসিংহেই ছিলেন ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত। তারপর বিদ্যাসাগরের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগর শুধু পিতামাতার কেন, কোনও আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তির ধর্মাচরণে বাধা দেন নি; যদিও তিনি নিজে কোনও দিন মন্ত্রোচ্চারণ করেন নি বা কোনও হিন্দু দেবদেবীর পূজা করেন নি।[২০] অপরের ধর্মাচরণের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব কখনও দেখা যায়নি, এমনকি সেই আচরণের মধ্যে কিছুটা অমানবিকতা থাকলেও। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের চাকুরি পরিত্যাগের অল্পকালের মধ্যেই তাঁর স্নেহময়ী পিতামহীর মৃত্যু হয়। শম্ভুচন্দ্রের কথায়, "সন ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া, বীরসিংহ হইতে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়। শালিমার গঙ্গাতীরে বিনা আহারে কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া কুড়িদিন পরে গঙ্গালাভ করেন"।[২১] আনুমানিক আশী বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধাকে গঙ্গার তীরের এক চালাঘরের মধ্যে কুড়িদিন কেবলমাত্র জল খাইয়ে রাখার অর্থ তাঁকে নিশ্চিত ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। দুর্গাদেবীর বাঁচার ইচ্ছা ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু অশ্রুপূর্ণ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদিমার বাঁচার ইচ্ছা ছিল বলেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। "১৭৫৭ সনে দিদিমার (তিনি দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী ছিলেন) মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিসনে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটা খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিন দিন-রাত্রি জীবিত ছিলেন।"[২২] দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি বাধা দিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না—তবে তিনি যে ধর্মীয় আচারের নামে এই নিষ্ঠুরতাকে মেনে নিয়েছিলেন তা তাঁর নীরবতা থেকেই স্পষ্ট। পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবশ্য বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গেই হয়েছিল। "অগ্রজ মহাশয় পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রাদ্ধের ব্যয়ার্থ রীতিমত টাকা দিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সমাগম হইয়াছিল।...অন্যূন তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন, এবং পরদিবস আরও প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃদের পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।"[২৩] সুবলচন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "But he, nevertheless, never objected to the members of his family following their own beliefs or acting up to the rites of their respective faiths. On the contrary, he rather encouraged them and helped them in the performance of those rites and he was often heard to say that it was improper to throw obstacles in the way of one's acting up to one's faith"[২৪]

কাশীতে বসবাসকালে ঠাকুরদাস যখন যা করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর সে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। বিদ্যাসাগর নিজেও অনেকবার কাশী গিয়েছেন, দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন, কিন্তু কোনওদিন মন্দিরে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। ঠাকুরদাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সদাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন; তাঁদের বেদজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। আবার মূর্খ ও লোভী বাঙালি ব্রাহ্মণদের তাঁর নিকট অর্থ দাবি করলে তিনি তাঁদের কিছু রূঢ় সত্যকথা শুনিয়ে দিয়েছেন। "আপনারা যত প্রকার দুষ্কর্ম করিতে হয় তাহা করিয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীবাস করিতেছেন। এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ব্রাহ্মণেরা বলেন, "আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না।" বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।"[২৫] তাঁর কাছে তাঁর পিতা মাতাই যে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা একথাও জানিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের মন্তব্যের মধ্যে অনিবার্যভাবে কিছু ক্রোধ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের চিত্রটিও হঠাৎ স্বীকৃতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে দীনময়ী দেবীর মৃত্যুর পর

কলকাতাতে নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধাদি কার্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি করিয়েছিলেন; আবার নারায়ণকে বীরসিংহে পাঠিয়ে সেখানেও শ্রাদ্ধান ভোজন এবং দেশাচার অনুসারে "আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের ভোজন ও সধর্বনা কার্য্যাদির জন্য বীরসিংহায় পাঠাইয়া ছিলেন।"[২৯] ভগবতী দেবীর মৃত্যুর পর (১৮৭১) "দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতি সম্রিহিত কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে চন্দন দেহু করিয়া উর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করেন। শাস্ত্রানুসারে একবৎসর কাল শোক-চিহ্নরূপ নিরামিষ পাক করতঃ এক সন্ধ্যা ভোজন করিয়া শরীর ধারণ করিতেন।"[৩১] এক বৎসরের জন্য তিনি জুতো ব্যবহার করেননি, নরম বিছানায় শয়ন করেননি বা কোনও বিলাস দ্রব্যও ব্যবহার করেন নি। এই কৃচ্ছ্র সাধন দেশাচার সম্মত। সন্দেহ নাই বিদ্যাসাগর মাতার মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়েছিলেন এবং প্রায়ই মায়ের নাম স্মরণ করে অশ্রুপাত করতেন। পিতার মৃত্যুর (১৮৭৬) পরও তিনি অনুরূপ শাস্ত্র-সম্মত শ্রাদ্ধাদি করেছিলেন। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও তিনি শাস্ত্র ও দেশাচার সম্মত প্রথা মেনে চলতেন বলে জানা যায়, যদিও তাঁর মতামত কোনও সময় কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তু করেনই নি, কেউ তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি সে সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করতেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু নিজের কন্যার বিবাহের অনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন; নিজের কোনও মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন নি। "নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধহয়, তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য।"[২৮]

গায়ত্রী ভুলে গেলেও বিদ্যাসাগর কিন্তু দৃশ্যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। যজ্ঞোপবীত শিখা এবং ধুতি-চাদর চটিতে চিরাচরিত ব্রাহ্মণের রূপটিই স্পষ্ট। আবার বাড়িতে আসবাব পত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিচয়। লেপাপড়ার কাজকর্ম করেন চেয়ার টেবিলে। বাড়িতে ঠাকুর দেবতার ছবি বা মূর্তি নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি করেন না। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যাসাগরকে জানতেন তাঁর শেষ দশ-বার বৎসর। তিনি লিখেছেন, "বাড়িতে তো কোনও পুজো হ'তে দেখিনি···অনেকদিন কেটেছে এমন যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে, সেখানেই খাবার টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা আহ্নিক করতেও দেখিনি।"[২২] কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের চিহ্ন উপবীত ত্যাগ করেন নি। রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর উপবীত ত্যাগ করেন। এতে রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। রামতনুকে পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করতে হল। সব শুনে বিদ্যাসাগর রামতনুকে বললেন, "বাপের কথায় পৈতে গাছটি রাখতে পারলে না।"[৩০] পরে রামতনু যখন উত্তরপাড়া স্কুলের হেড মাস্টার তখন তাঁর উপবীত ত্যাগের ঘটনা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে তাঁকে একটি সামাজিক অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কোনও দোকানদার তাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বিক্রি করতেন না। তাঁর বাড়িতে কাজ করতে রাঁধুনিরাও অস্বীকার করল। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর নৌকাযোগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও রাঁধুনি পাঠিয়েছেন, একবার নয়, বেশ কয়েকবার।[৩১] বিদ্যাসাগরের নিকট উপবীতের কোনও বিশেষ মাহাত্ম্য নেই—তার গ্রহণ ও বর্জন সমান অর্থহীন। উপবীত ত্যাগ করলে যদি আত্মীয়দের মনে দুঃখ দেওয়া হয়, তবে তা ত্যাগ না করাই শ্রেয়। আবার উপবীত ত্যাগের ফলে রামতনুর অসুবিধা লাঘব করতে যদি সামাজিক সাহায্য করেছেন যা প্রকারান্তরে রামতনুর কাজের নৈতিক সমর্থন বলেই মনে করা যায়। তাঁর অসাধারণ বাস্তব বোধের ফলে তিনি কয়েকটি আচার-আচরণকে মেনে নিয়েছিলেন, কোনও ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রেরণায় নয়, বাস্তব দিক থেকে এগুলি অনাবশ্যক সংঘাত সৃষ্টি করবে না বলেই। কিন্তু যে বিষয়গুলিতে তাঁর বিশ্বাসের প্রশ্ন অনিবার্য ভাবে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানেই বিদ্যাসাগর দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। মৃত্যুর দুই-তিন মাস আগে তাঁর কন্যা বাড়িতে একতলার একটি ঘরে "পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা"[৩২] করেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসর রোগভোগের ফলে শারীরিক দিক থেকে জীর্ণ ও দুর্বল। সাধারণ মানুষ এইরূপ অবধারিত মৃত্যুর ছায়ায় মানসিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু বিদ্যাসাগর স্বস্ত্যয়নাদিতে সায় দিতে পারেন নি। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "নিজের তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায় কেবল কন্যা প্রভৃতির অনুরোধে বাড়িতে এই হোম করিতে দিতে রাজী হ'য়েছিলেন। একতলার যে ঘরে হোম হয়েছিল সেটি ছিল দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির পাশে।" কিন্তু সে ঘরে বিদ্যাসাগর প্রবেশ করেন নাই। কন্যার বিশেষ অনুরোধে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেসে বলেন, "মা, এইখানেও

দোঁড়া আসছে, মনে দুঃখ করিস্ না।"[৩৩]

(৩)

ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত অনেকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট কেউ কোনও স্পষ্ট জবাব পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুসারে একবার "দুইজন ধর্মপ্রচারক এবং কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক" বিদ্যাসাগরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "ধর্ম যে কী তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষের জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও প্রয়োজন নাই।"[৩৪] কিন্তু শম্ভুচন্দ্র যদি যথাযথ উদ্ধৃত করে থাকেন তবে তাঁর শেষ বাক্যটি অর্থবহ, "আমার বোধহয় যে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এইরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ এই তর্ক থাকিবে, কস্মিন কালেও ইহার মীমাংসা হইবে না।" সুতরাং ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিকে সাধারণ মানুষের হিসাবের বাইরে রাখাই শ্রেয়। এটি "নব্যযুগের" মানবকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের মত। বিদ্যাসাগর ধর্মকে শুধু আলোচনার বাইরে নয়, জীবনের বাইরে রাখারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। একবার দুইজন ধর্ম প্রচারককে ধর্ম প্রচারের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি গল্পও বলেছিলেন বিদ্যাসাগর। পাপের জন্য ঈশ্বরের দরবারে সবাইকেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেহেতু ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে কেউই সঠিক জানেন না, তাই মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য ঈশ্বরের নিকট ধর্ম প্রচারকদের শাস্তির মাত্রা বেড়ে যায়। বিদ্যাসাগর মজা করে বললেন "আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না।"

বস্তুত পক্ষে ধর্ম প্রচারকদের বিদ্যাসাগর ঠিক মেনে নিতে পারতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর একদিন একজন ক্রিশ্চান পাদরিকে ধর্মালোচনায় আহ্বান করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে এমন যুক্তি বিন্যাস করলেন যে পাদরি উপযুক্ত জবাব না দিতে পেরে রুষ্ট হয়ে বললেন, "বৃদ্ধ বয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পর নরকেও আপনার স্থান হবে না।"[৩৫] বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়ির নিকটে বসবাসকারী জনৈক ব্রাহ্ম প্রচারক একদিন দর্শনপ্রার্থী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে অনেক পথ ঘুরিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌছে দেন। বৃদ্ধের এই অযথা হয়রানির কথা শুনে বিদ্যাসাগর সেই ব্রাহ্ম প্রচারককে তিরস্কার করে বলেন, "যার জানা পথে এত গোল, সে না-জানি অজানা পথে লোকের কত দুর্দশা ঘটায়। তুমি বাপু একাজ আর কোরো না।"[৩৬]

শশধর তর্কচূড়ামণি কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নামকরা দর্শনশাস্ত্রবিদ ও ধর্ম প্রচারক; হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার সময় কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর কথা প্রসঙ্গে তর্কচূড়ামণিকে বলেন, "আমিও দর্শন পড়েছি। দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভাল বোঝা যায় না। পণ্ডিত মশায় পড়াবার সময় যখন জিজ্ঞেস করতেন, 'ঈশ্বর বোঝো তো'? আমি বলতাম, আপনি যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।' আমার কথা শুনে পণ্ডিত মশায় খুব হাসতেন।"

তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার আগে তাঁকে বিদ্যাসাগর বললেন, "আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন, লোকে বলবে বেশ বলেন ভালো। এই রকম একটা প্রশংসা পাবেন, আর কিছু না। আমার স্কুলের (মেট্রোপলিটান) ছেলেরা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে তা একেবারেই মনে করিনা।"[৩৭]

কাশীতে একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসায় গিয়েও দেখা পান নি। বিদ্যাসাগর বাঙালি টোলায় গিয়ে খোঁজ করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যাসাগর সম্ভবত ভেবেছিলেন ভদ্রলোক কোনও বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে কঠিনতম প্রশ্নটি করলেন, যে প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত বিদ্যাসাগরও সঠিক ভাবে জানতেন না। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি অপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তবে তাহাই আপনার ধর্ম।" বিদ্যাসাগরের নিকট ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সান্ত্বনার ব্যাপার।

অমূল্য চরণ বসু ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরিবারের ডাক্তার এবং বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন। "তিনি একবার অনুনয় বিনয় করায় শেষে বলিয়াছিলেন, 'গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়'।[৩৮] গীতার কোন উপদেশ? নিষ্কাম কর্মের? সম্ভবত তাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্নেহের সুযোগে অনেকে অনুনয় বিনয়ের ফলে অমূল্যবাবু যে জবাব পেয়েছিলেন তাতে বিদ্যাসাগরের নিজের বিশ্বাসের ছবিটাই ছিল অনুপস্থিত।

একবার এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে বিদ্যাসাগর

বললেন, "তারা বলছে শুনলাম, আমরা মুশীরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, আরে বাপু, ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য তো মরে ভূত হ'য়ে গিয়েছে, পায়ের ধুলো কি রে বাবা।"[৪৯] মানুষকে অবতার রূপে পূজা করার ব্যাপারটি তাঁর বিচার বুদ্ধির বাইরে ছিল বলেই মনে হয়। মানুষের পূজাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগর যে আকর্ষণীয় রসিকতা করতেন তার উদাহরণ নিচের কথোপকথনটি। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কাশী বাস করে সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনের কিছুদিন পূর্বে একবার আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভট্টাচার্য মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণে আসনে বসাইয়া তামাক দিতে বলিয়াই বলিলেন, 'তুমি মরিয়াছ নাকি ?'

—কেন আমি মরবো কেন ? ম'লে কি আসতেম ?

—তা দেখো আমাকে যেন পেয়ে বসো না।

ভট্টাচার্য মহাশয় তামাক খাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তোমার শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটলো না। তা গেছ ত আবার ঐ রকম স'রে পড় কেন ? জান ত কাশীবাস ক'রে বাইরে ম'লে কী হয় ?

—হাঁ তা জানি, তবুও মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়।

—শিগ্‌গির শিগ্‌গির পালাও, না হ'লে কাশীর এপারে ওপারে ভিতরে বাহিরে অনেক ফারাক, বলি, একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ ত' ?

—কেন গাঁজা খেয়ে কী হবে ?

—বলি একটু অভ্যাস রেখো, কি জানি কখন কী কাজে লাগে, বলা ত' যায় না। মনে কর যদি তোমার কাশী প্রাপ্তি হয় তাহ'লে তো শিব হবে ? শিব হ'লে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে তখন টানতে হবে ত ? আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে দম আটকে মরে যাবে, আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।"[৫০]

রস সমৃদ্ধ এই কথোপকথনটি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছু-দিন আগেই ঘটেছিল। সেই সময়ও বিদ্যাসাগর কাশী, শিব ইত্যাদি নিয়ে উপভোগ্য রসিকতা করেছেন। গান বাজনা বা তাঁর সময়ের থিয়েটার-কবিগান ইত্যাদিতে বিদ্যাসাগরের কোনও আগ্রহ ছিল বলে জানা যায় না। বিধবা বিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে যে সব গান ইত্যাদি লেখা হয়েছিল তার কয়েকটি তিনি শুনেছিলেন সেগুলির বক্তব্য জানবার জন্য। মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি মায়ের স্মরণে প্রায়ই অশ্রুপাত কর-তেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয়—এই কন্যার শ্বশুর মহাশয় শ্যামা সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। শুধু 'মা' নামেই বিদ্যাসাগরের তৃপ্তি হত বলে "কেবল যে যে গানে মা মা থাকিত সেই গানই শুনিতেন। গানে শখ ছিল না ; কিন্তু মাতৃনাম পূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত। মাতৃভক্তের এমনই প্রাণ বটে"।[৫১] বিহারী লালও এই গান শোনার আগ্রহকে মাতৃভক্তির প্রকাশই বলেছেন—প্রচ্ছন্ন কালী সাধনার প্রয়াস বলে অভিহিত করতে পারেন নি। বিহারী লাল একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, "যিনি বেহালা বাজাইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন," তিনি বিদ্যাসাগরকে গান শোনাতেন বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনিই অখিলদ্দিন। চণ্ডীচরণ বহু অনুসন্ধানে "তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে" অনেক সাধ্য সাধনার পর "গানগুলি লিখে নিয়েছিলেন। অখিলদ্দিন বলেছিলেন, "বিদ্দেসাগরবাবু আমায় বড় ভাল বাসিতেন, আর এই গান শুনিয়া খুব খুশী হইতেন। তাহার নিকট অনেক পয়সা পাইয়াছি।"[৫২] চণ্ডীচরণের মতে গান শোনার ঘটনা, "অনেক দিনের কথা", সুতরাং মৃত্যুর কিছুদিন আগের ঘটনা নয় বলেই মনে হয় ; কারণ অখিলদ্দিনও ভাল স্মরণ করতে পারেন নি বিদ্যাসাগর তাকে কত পয়সা দিতেন। কিন্তু প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে যে বিদ্যাসাগর কি ঈশ্বর প্রেমে আকুল হয়ে অশ্রুপাত করতেন ?

অখিলদ্দিনের বাউল গানগুলিতে একটি মিষ্টিক উপলব্ধির বিষয় আছে, সেটিকে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা মনে করলে যথার্থ বিষয় অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। এই বাউল গানগুলি কি শুধু ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ? এই গানের কথা ও সুর বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রিয় গ্রাম, সেখানের শস্য-গন্ধ-স্পর্শের অনুষঙ্গ, গ্রামের মানুষজন, বিশেষত তাঁর পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিত না ? সেই স্মৃতি তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করত না ? যে ঈশ্বর প্রেমের গভীরতায় ভক্ত মানুষ অশ্রুমোচনে প্ররোচিত হন, সেই প্রেমে সংশয় বা সন্দেহের ছায়াটুকু পর্যন্ত থাকে না। এই গানগুলি যদি বিদ্যাসাগরের চিত্তের সুপ্ত ঈশ্বর প্রেমকেই আলোড়িত করে থাকে তবে তিনি জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে পারেন নি কেন ? তাই এই গানগুলির প্রতি বিদ্যাসাগরের আকর্ষণকে ঈশ্বর-

প্রেমের নির্দেশিকা বলে মেনে নিলে তাঁর মানসিকতাকে যথার্থ অনুসরণে ত্রুটি থেকে যাবে।

বস্তুত পক্ষে বিদ্যাসাগর অনেকবার ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন। একজন দুষ্টলোক এক বিধবার সর্বস্ব অপহরণ করে তার উপর অত্যাচার করছে। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন "এই জগতের মালিককে যদি পাই তা'হলে একবার দেখি। এ জগতের মালিক থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে।"[৪৩] ঈশ্বর নিরীহ নিরপরাধের রক্ষাকর্তা এই বক্তব্যর প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর একবার চেদিস খানের অহেতুক নিষ্ঠুর গণহত্যার উল্লেখ করে বললেন, "এই হত্যাকাণ্ড ও ঈশ্বর দেখলেন ? কই, একটু নিবারণ করলেন না। তা তিনি থাকুন, আমার দরকার বোধ হ'চ্ছে না।"[৪৪] ১৮২৭ সালের জুন মাসে 'স্যার জন লরেন্স' নামে কলকাতা থেকে পুরী-গামী একটি জাহাজ ঝড়ে পড়ে এবং বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। জাহাজের প্রায় আটশত যাত্রী রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছিলেন। একজন তীর্থ যাত্রীও বাঁচেন নি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাংলা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে।[৪৫] বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক ভাবেই শোকে দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বললেন, "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর ? কেমন করে তিনি পরম করুণাময় হ'য়ে এক সঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাত-আটশত মানুষ ? এই কি দুনিয়ার মালিকের কাজ ? এই সব দেখলে এই দুনিয়ার কেউ মালিক আছে বলে শ্রদ্ধা মনে হয় না।"[৪৬] চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে এইরূপ তীব্র গভীর আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ তাহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, এইরূপ মর্ম্ম পীড়ায় ঈশ্বরের অনেক ভক্ত সন্তান অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিবার সময় এইরূপ ভাবের পরিচয় দিয়া ফেলেন।" যদি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ঈশ্বর ভক্তির প্রশ্নাতীত পরিচয় পাওয়া যেত তা হ'লে এই সব আক্ষেপোক্তিকে 'ভক্ত সন্তানের অন্তরের গভীর বেদনা' অথবা ঈশ্বরের উপর অভিমান বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়ত্ব প্রমাণ পাওয়া মুস্কিল। তার উপর চণ্ডীচরণের নিজেরই বক্তব্য যে বিদ্যাসাগর "যাহা নিজ হৃদয়ের অনু-অনুমোদিত তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।" এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণ যোগ্য কারণ তাঁর চরিত্রে দুর্লভ দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। চণ্ডী চরণের উপরিউক্ত বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হলে বিদ্যাসাগর তাঁর গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসকে সংশয়ের একটি আবরণ সৃষ্টি করে তার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে পেরে-ছিলেন—এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিদ্যাসাগর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

বিদ্যাসাগরের সংশয় প্রকাশকে তাঁর সৎ অন্তঃকরণের অকপট সরল প্রকাশ বলে মনে করাই শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী গুপ্ত একদা কথা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন ? উত্তর হইল, 'ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলো যাকে বলে অজ্ঞেয় বাদী'।"[৪৭] এটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নয়। ক্ষুদিরাম বসুও বলেছেন, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। মোটের উপর মনে হয় তিনি agnostic বা সংশয় বাদী ছিলেন।[৪৮] ক্ষুদিরাম বসু একই নিশ্বাসে বিদ্যা-সাগরকে একেশ্বরবাদী ও সংশয়বাদী বলেছেন। দুটির মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট। তাঁর দেওয়া উদাহরণে অবশ্য আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে তাঁর পক্ষপাতিত্ব সংশয়বাদীর দিকেই। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলাও যেমন দুষ্কর, তেমনি তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বললে অব-ধারিতভাবে সত্যের অপলাপ হবে। তিনি অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী ছিলেন—এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে সত্যের সব থেকে কাছাকাছি। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে বিদ্যাসাগরের মতে বিখ্যাত ব্যক্তি পরম যত্নে সার্থকভাবে নিজের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের জগৎটিকে সাধারণ মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ছিল কি না তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

(৪)

ধর্ম বিশ্বাসের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ১৮৫০ সালে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে পুজোর কাজ করতে এসে, পরে মন্দিরের পুরোহিত এবং সাধনার ফলে তাঁর 'ঈশ্বর দর্শনের' সুযোগ হয়েছিল। তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 'ভদ্রলোক' সমাজের একটা অংশ তাঁর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, গিরীশ ঘোষ

ইত্যাদি। জমিদার-ব্যবসায়ী শ্রেণীর কিছু ব্যক্তিও তাঁর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যের বাড়ি ছাড়াও কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।

রামকৃষ্ণের উপদেশের ভাষা ছিল সরল ও গ্রাম্য; বক্তব্যের মধ্যে যে উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন তাও গ্রাম্য জীবন থেকে নেওয়া। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। তাই ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়কে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণের নিকট উপস্থিত করতে পেরেছেন এবং তার মধ্য থেকেই তাঁর নিজের চিন্তাও একটি নির্দিষ্ট আকার নিয়েছে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণের ধর্মোপদেশের ও চিন্তার দু'একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিরা ছাড়াও ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তকরা সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মের সংস্কার করে যে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করলেন তা বিভিন্ন কারণে সমাজের শিক্ষিত স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তাছাড়া ব্রাহ্মদের মধ্যেও দল-উপদলের সৃষ্টি হয়ে ধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টাকে স্তিমিত করে দিল। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগগুলিও ব্যাহত হয়েছে কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ঐ সংস্কার প্রচেষ্টাকে গতি দেওয়ার মত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের উপদেশগুলি একটি নতুন ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত করল। 'নিরাকার ব্রহ্মের' উপাসনা ছেড়ে সাকার দেবতার পূজা সাধারণের নিকট অনেক আকর্ষণীয় হল। তাছাড়া জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি —এই তিন মার্গের মধ্যে রামকৃষ্ণ জোর দিলেন ভক্তি মার্গেই, কিন্তু কোনও পথেরই তিনি নিন্দা বা সমালোচনা করলেন না। ভক্তি মার্গের অনেকগুলি ভাবের মধ্যে আবার প্রাধান্য পেল 'সন্তান ও দাস্যভাব'। কর্ম মার্গের আলোচনায় রামকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথা বললেও সমাজের সংস্কার মূলক বা সেবামূলক কাজকর্মকে ঈশ্বর লাভের উপায় বলে মনে করতেন না। শম্ভু মল্লিক তাঁর শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁর স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি জনসেবা মূলক কাজকে তিনি প্রকৃত ভক্তের কাজ বলে মনে করতেন না। "যত মত তত পথ" এই সহজ বাক্যটিকে জনপ্রিয় করে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার এক নতুন দিক খুলে দিলেন। ফলে অন্য মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না।

রামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর মত ও পথ হল ব্যক্তিগত ভাবে সাধনাই ঈশ্বর লাভের উপায় স্বরূপ। ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই রামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর লক্ষ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দ কিন্তু রামকৃষ্ণের এই মূল লক্ষ্যটিকে কিছু পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন।[৩১] বস্তুত পক্ষে বিবেকানন্দের নেতৃত্বেই দরিদ্রনারায়ণ সেবা থেকে শুরু করে মানুষের সবরকমের সেবাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তির থেকে জ্ঞান ও কর্মের উপর বেশি জোর দেওয়া হল।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বাং ১২৬১-১৩৩৯) বিদ্যাসাগর স্থাপিত মেট্রোপলিটন স্কুলের (শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ) শিক্ষক ছিলেন এবং ১৮৮২ সাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করতেন, এবং ঘনিষ্ঠ ভক্তদের একজন রূপে পরিচিত ছিলেন, যদিও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেননি। তিনি রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ সাড়ে পাঁচ বৎসরের (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ থেকে অগস্ট ১৮৮৬) মধ্যে ১৮৬ দিনের কথোপকথনের একটি চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটিকে তাঁর সমসাময়িক সকলেই সৎ ও তথ্যনিষ্ঠ বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৮২ সালের ৫ অগস্ট বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়িতে। প্রায় ৪ ঘণ্টা রামকৃষ্ণ এই বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগরের বয়স ৬২ পূর্ণ হতে চলেছিল, আর রামকৃষ্ণের বয়স ৪৬½ বৎসর। বিদ্যাসাগর তার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম থেকেই বাংলা দেশে সুপরিচিত। কলকাতার ভদ্রলোক সমাজে রামকৃষ্ণের পরিচিতি কম ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিকতা অনুযায়ী ধর্মের জগতের মানুষের খোঁজ-খবর বিশেষ রাখতেন না। তাই শ্রীম যখন বিদ্যাসাগরকে জানালেন যে রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে আসতে চান, তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন, "কী রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরেন?" স্বভাবতই বিদ্যাসাগর সাময়িক পত্রিকায় রামকৃষ্ণর উপর প্রকাশিত লেখাগুলি পড়েন নাই। যাই হোক শ্রীম-এর কথায় "বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন।"[৩২] এই কথামত ৫ অগস্ট ১৮৮২ বেলা ৪টার সময় রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কয়েকজন শিষ্য এবং শ্রীমকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ির অভিমুখে রওনা হলেন।

শ্রীম লিখেছেন রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছিলেন চার ঘণ্টা—৫টা থেকে রাত্রি ৯টা। বিদ্যাসাগর এই সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের আগমনের জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন, এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিদিনের মত কিছু প্রার্থীও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, এ ছাড়াও ছিলেন বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা। রামকৃষ্ণ যখন সশিষ্য সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম করার হল্ ঘরে এলেন, তখন "তিনি দু একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন। ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরের পরণে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল, সব দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁতগুলি বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ, তাই গলায় উপবীত।" শ্রীম-এর বর্ণনাটিতে শুধু বিদ্যাসাগরের চিত্রটিই নয়, পারিপার্শ্বিক ও আবহটিও সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের উৎসুক প্রতীক্ষার বা প্রয়োজনাতীত আগ্রহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কিঞ্চিদাধিক যে চারঘণ্টা সময়, রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করেছেন, কয়েকবার অল্প সময়ের জন্য ভাব-সমাধি-প্রাপ্ত হয়ে নীরব থেকেছেন, চারটি রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনিয়েছেন। গানগুলি গেয়ে তিনি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে প্রাঞ্জল করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাব ও আবেগের আবহও তৈরি হয়েছিল। রামকৃষ্ণ বস্তুত পক্ষে, আলোচনা শুরু করেন তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত বাকপটুতায় এবং অজস্র গ্রাম্য জীবনের চিত্রকল্প ব্যবহার করে। তাঁদের কথোপকথন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে রামকৃষ্ণ প্রথম দিকে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেছেন বেশ সোজাসুজি সুন্দর উপমার সাহায্যে। খাল বিল হদ্দ (হ্রদ) নদী দেখার পর সাগর দেখা, কিংবা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান, অন্নদানের উল্লেখ এবং তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা করার একটি চেষ্টা কেমন ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ব্যাজস্তুতিতে এবং অবশেষে শ্লেষে পরিণত হল তা পাঠকের নজর এড়াবে না বলেই মনে হয়। বিদ্যাসাগর "দরকচা মারা পণ্ডিত" নয়, বলেছেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু প্রায় চারঘণ্টা ধরে উপদেশ দেওয়ার পর রামকৃষ্ণ যে বিদ্যাসাগরের উপর গভীর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি তা সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমস্ত সময়টিতে বিদ্যাসাগর দু একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছাড়া মোটামুটি নীরবই ছিলেন। প্রথমে রামকৃষ্ণের মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগর সেভাবে সরস জবাব দিয়েছিলেন—ধীরে ধীরে সে রূপ বাক-পটুতাও কমে এল। কথোপকথনটি অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণে, বাক্যবিন্যাসের কৌশলে এবং সহজ ভাষায় দুরূহ বিষয় সহজবোধ্য করার ক্ষমতায় বেশ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ ভাবে রামকৃষ্ণের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন তাও মনে হয় না। কিংবা বলা যায়, রামকৃষ্ণ তাঁর মতামতকে সম্যকভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ ব্যক্ত করেছেন কামিনী কাঞ্চনের প্রতি তাঁর ঘৃণা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে ঈশ্বর লাভের জন্য ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব, অনির্বচনীয় ব্রহ্মর নির্লিপ্ততা ইত্যাদি। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই, রামকৃষ্ণের এই কথাটি বিদ্যাসাগরের নিকট নতুন মনে হয়েছে এবং তিনি তা অকপটে বলেছেন। ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যায় রামকৃষ্ণ দাস্যভাব ও সন্তান ভাবের ব্যাখ্যা করে এই মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর নিজের ভাবের কথাও জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেও তিনি যে রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন অথবা রামকৃষ্ণের বিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে নিজেও বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন তা মনে হয় না। তাই রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কী ভাব জানতে চাইলেন, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, "আচ্ছা, সে কথা একলা একলা আপনাকে একদিন বলব।" রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসের সংশয় সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিয়ে বললেন, "তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।"

বিদ্যাসাগর যদিও কয়েকটি মাত্র কথা বলেছিলেন, তবুও তার সংশয়ী চিত্তটির সামান্য আভাসও দিয়েছেন এই কয়েকটি মাত্র কথাতেই। উল্লেখ্য, তিনি কোনও তর্কের সৃষ্টি করেন নি কারণ তা শুধু শিষ্টাচার বিরুদ্ধই হত না, তা হত সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অরুচিকর। সকলের শক্তি সমান নয়, এই বক্তব্যটি যখন রামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন, "তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি

নিয়েছেন?" বিদ্যাসাগর সম্ভবত মানুষ এবং অন্যান্য জীবের গুণ ও ক্ষমতা তাদের পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই রূপ কোনও বস্তুবাদী ধারণা থেকে কিংবা ঈশ্বর সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন এইরূপ কোনও জনপ্রিয় ধারণা থেকে এই প্রশ্নটি করে থাকবেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের রসিকতা এই প্রশ্নের উত্তরে স্থলসে উঠল। তিনি বললেন, "তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আর কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়? আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে ছুটো?" বিদ্যাসাগর অবশ্য এবিষয়ে আর কোনও কথাই বলেন নি। রামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতে অবশ্য কোনও রোষ ছিল না; কিন্তু বিদ্যাসাগর যে তাঁর সমস্ত যুক্তিকে গ্রহণ করতে পারছেন না তার কিছু আভাস পেয়েছিলেন। শ্রীম-এর বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের বাচনভঙ্গীতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, গানের গলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তৃতীয় রামপ্রসাদী গানটি গাওয়ার পর, "ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবিদ্ধ, দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এক অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিবদ্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।" স্বভাবতই বিদ্যাসাগর বিহ্বল হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বিদায় নেওয়ার কিছু আগে যে কথোপকথনটি হল তাতে স্পষ্ট হল যে বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের মধ্যে মানসিক দূরত্ব খুব বেশি কমেনি। কথোপথনটি উদ্ধৃত করলে অনুধাবনের সুবিধা হবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—এ যা বললুম বলাবাহুল্য আপনি সব সব জানেন—তবে খপর নাই (ঘাটাল আরামবাগ অঞ্চলের কথ্যভাষা)—নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বরুণ রাজার খপর নাই। বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।"

ভক্তি মার্গের বিষয়, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের জানা আছে, তবে তাঁর যথার্থ উপলব্ধি নেই—এবং নেই বলেই রামকৃষ্ণ ধারণা, তাঁর ঈশ্বরের উপর আস্থা নেই। রামকৃষ্ণ স্পষ্ট করে একথা বলেন নি বটে, কিন্তু যে উপমাটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা বিদ্যাসাগরের অধ্যাত্ম জীবনের অসম্পূর্ণতার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। পরবর্তী কথোপকথনটি এই ধারণাকে সমর্থন করছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি ছি।

বিদ্যাসাগর—সে কি? এমন কথা বল্লেন কেন, বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলে ডিঙ্গি। (সকলের হাস্য) খাল, বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর সহাস্য বদনে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)।" রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে তাঁর কাছে নয়, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নয়, রাসমণির বাগানে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। বাগান দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ কি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরে অনাসক্তি স্মরণ রেখে? বস্তুতপক্ষে কথোপকথনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত স্বল্পবাক এবং ঈশ্বরের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নি। রামকৃষ্ণের আমন্ত্রণের উত্তরে বিদ্যাসাগরের জবাবটিও উল্লেখ যোগ্য। রামকৃষ্ণ যেমন সচেতনভাবে দক্ষিণেশ্বরের উল্লেখ করেন নি, বিদ্যাসাগরও তেমনি রামকৃষ্ণের তাঁর বাড়িতে আগমনকে কোনও ধর্মগুরুর আগমন হিসাবেও গণ্য করেন নি—এটিকে একটি সামাজিক ব্যাপার মনে করেছিলেন। তাই সামাজিক কৃত্য হিসাবে তাঁরও রামকৃষ্ণের বাড়িতে প্রত্যাগমন করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় আপাত বিস্ময়ের মধ্যেও যে একটু তীক্ষ্ণ শ্লেষ ছিল তা কারুর দৃষ্টি এড়াবে না বলেই মনে হয়। নিজেকে জেলেদের ছোট ডিঙ্গির সঙ্গে তুলনা করে তার অবাধ গতির সঙ্গে, বড় জাহাজ যে কেবল সমুদ্র ও বড় নদীতেই যেতে পারে সেকথার উল্লেখ করলেন। বিদ্যাসাগরের বিপুল জ্ঞান বড় জাহাজের ন্যায় তাঁর চলাচলের ক্ষেত্রকে সীমিত করেছে। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের ও মানসিক দিক থেকে কিঞ্চিৎ জড়ত্বের ইঙ্গিত এই কথোপকথনে আছে। এটি সহজে পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে বলে মনে হয় না। এই শ্লেষটুকুও বিদ্যাসাগর গায়ে মাখলেন না। তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই কথা বললেন এবং কোনও ভাবেই তাঁর নিজের বিশ্বাসের ছবিটি দৃষ্টির সীমার মধ্যে নিয়ে এলেন না। রামকৃষ্ণের সুবোধ্য বক্তব্য অনেক ভক্তকে রামকৃষ্ণের প্রতি এবং দক্ষিণে-

শ্বরের প্রতি আগ্রহী করেছিল, বিদ্যাসাগর কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে দূরেই অবস্থান করেছেন। তবুও বিদ্যাসাগর যে রামকৃষ্ণের বাক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার একটি নির্ভুল প্রমাণ রামকৃষ্ণের বিদায়কালে বিদ্যাসাগরের ব্যবহার। তিনি নিজে বাতি নিয়ে পথ দেখিয়ে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দিলেন। শ্রীম-এর কথা অনুসারে, "বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।" প্রায় ১৬ বৎসরের ছোট রামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগর নমস্কার করেছিলেন বলেই মনে হয়। আগমন ও বিদায়ের সময়ে আচরণের পার্থক্যেই বিদ্যাসাগরের পরিবর্তিত ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

আমন্ত্রণ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে যান নি। এই সাক্ষাতের পর বিদ্যাসাগর আরও নয় বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৮-এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার কার্যোদ্ধারে গিয়েছেন; কলকাতার নিকটবর্তী চন্দননগর, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি জায়গাতেও যাতায়াত করেছেন—কিন্তু রাসমণির বাগান তার কাছে অগম্য এবং অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের অবশিষ্ট জীবনের ধারাও রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। রামকৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যাসাগরের প্রতি স্নেহ হয়ে তার সমালোচনা করেছেন। ১৮৮৩ সালের ১০ই জুন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তিনি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এককথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়। যখন বললুম শক্তি বিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বললে মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বৈকি। শক্তি কম বেশী না হলে তোমার নাম এত হবে কেন, তোমার বিদ্যা তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো ছুটো শিং বেরোয় নাই। বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে, রুই কাতলা। তারপর জেলে পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুঁটি-পাকাল এই সব মাছ বেরোয়—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"

বিদ্যাসাগরের প্রতি রামকৃষ্ণের ক্ষোভ, তিনি যে অশ্রদ্ধেয়, যেভাবে উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন তারূঢ় এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কিছুদিন পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর আবার বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উঠতে রামকৃষ্ণ বললেন, "বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? বিদ্যাসাগর সেদিন বললে এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।" বস্তুত পক্ষে এই কারণেই রামকৃষ্ণের ক্ষোভ। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, গিরীশ ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, বিজয় গোস্বামী ইত্যাদি আরও অনেক সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তি রামকৃষ্ণের নিকট এসেছেন, কিন্তু আসবেন বলেও বিদ্যাসাগর এক বছরের মধ্যে এলেন না। এই ঔদাসীন্য রামকৃষ্ণকে আঘাত দিয়েছিল, হয়ত তাঁর আত্মবিশ্বাস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ ভাষা ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের প্রতি রূঢ় হয়েছেন।

রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ত্রুটিগুলির উল্লেখ কথোপকথনের সময়ই করেছিলেন। সাক্ষাতের প্রায় এক-বছর পরে, ২২শে জুলাই ১৮৮৩ সালে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলছেন—"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা রূপা আছে। যদি সে সোনার সন্ধান পেতো, এতো বাইরের কাজ যা করবে তাতে কম পড়ে যেতো, শেষে একে বারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে তারই ধ্যান চিন্তায় মগ্ন যেতো। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে রূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি আগেও বলেছেন, "ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই।" রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের ফলে তাঁর ভাণ্ডারে রত্নের বিষয়ে বিদ্যাসাগরও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নি। ঈশ্বর সম্পর্কে অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই সচেতন অনীহাটুকুই রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকারে এবং বিদ্যাসাগরের পরবর্তী আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কার্যাটারের আকর্ষণ তাঁর কাছে দুর্নিবার, কিন্তু রাসমণির বাগানের আহ্বানে তিনি কোনও আকর্ষণ অনুভব করেন নি। এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের কুহেলি সমাচ্ছন্ন মানসলোকের দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

(৫)

এই আলোচনায় একটি বিষয় খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল যে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত খুব নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করা মুস্কিল। তিনি এই দুই বিষয়েই নিতান্তই স্বল্পবাক এবং তাঁর রচনাবলীতেও এই সম্পর্কিত

আলোচনায় তিনি স্পৃহাহীন। উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মের যে প্রভাব ছিল সে কথা স্মরণ করলে বিদ্যাসাগরের নীরবতা বিশেষ আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এই নীরবতার দ্বারাই তিনি বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে তাঁর উত্তরসূরীদের পক্ষে অপরিহার্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সূচনা করেন।

ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে মতামত এবং ধর্মাচরণকে বিদ্যাসাগর নিতান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে করতেন। কাশীতে একজন কৌতূহলী ব্রাহ্মণ তাঁর ধর্মমত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন। "আমার মত কখনও কাহাকে বলি নাই, তবে এই বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র হয় মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তবে তাহাই আপনার ধর্ম।" অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিদ্যাসাগর ব্যক্ত করেছেন যে ধর্ম-বিশ্বাস ব্যক্তিগত এবং ধর্মাচরণ আপন আপন মানসিক সন্তোষের ব্যাপার ; এটি এমনকি পারস্পরিক আলোচনার বিষয়ও নয়। ধর্ম ও ধর্মাচরণের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত পক্ষে ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আধুনিক মননের শুভসূচনা। বিদ্যাসাগরের পূর্বে আমাদের দেশে এইরূপ চিন্তার অভাব ছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, আর্য সমাজ ইত্যাদি আন্দোলন ধর্ম ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার উপর জোর দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে অনেকাংশে শিথিল করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই সহিষ্ণুতা প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার সোপান। বিদ্যাসাগরের মানসিকতা তাঁর সময়ের থেকেও এগিয়ে ছিল বলে শুধু পরধর্ম সহিষ্ণুতাই নয়, ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তিজীবনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধানতম শর্তটিও পূরণ করেছিলেন। এই একটি মাত্র কারণেই তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম মানুষ বলা যায়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আধুনিক ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেন নি। বহুধর্ম বিশিষ্ট, বহু জাতিসত্তায় সমৃদ্ধ একটি দেশে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সর্বাধিক। সেই ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল বচনে নয় আচরণেও প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অসংখ্য সন্ত-স্বামী-বাবা-পীর-পয়গম্বর অধ্যুষিত এবং মন্দির-মসজিদ-আশ্রম-আখড়া শোভিত এই দেশে ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে ধর্মকে রাখার চেষ্টা না করে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধর্মাচরণের দৃশ্যগুলিকে জনসাধারণের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। ফলে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতাতে আঘাত লাগে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনাকে অনুধাবন করতে পারলে, ধর্ম ও ধর্মাচরণ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্থকভাবে অনুসরণ করতে পারলে ভারতবর্ষ আধুনিকতার পথে নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে পারত।

সূত্র নির্দেশ :

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, প্রথম কলেজ স্ট্রীট প্রা. লি, সংস্করণ, ১৩৯৪ পৃঃ ৯৫
২. ইন্দ্র মিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৯ পৃঃ ২০ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড. কলিকাতা ১৯০৪ পৃঃ ৮৯
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড পৃঃ ৩৫৫
৪. বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ. প্রথম পুস্তক বিপণি সংস্করণ ; ১৯৮৯, পৃঃ ১২০
৫. বিপিন বিহারী গুপ্ত : ঐ, পৃঃ ২৮৫-২৮৬
৬. তদেব, পৃঃ ২৭৯
৭. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : রসসাগর বিদ্যাসাগর, কলকাতা ১৯৯১, পৃঃ ৩০
৮. চণ্ডীচরণ : বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৪২
৯. ঐ, পৃঃ ৪৬৬
১০. ঐ, পৃঃ ৪৬৬
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬৭ ;
১২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬৬ ;
১৩. বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, ওরিয়েন্ট সংস্করণ, পৃঃ ৩৯ ;
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ২৬৯ ;
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫ ;
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১৭০ ;
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৪০ ;
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৭ ;
১৯. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, বুকল্যাণ্ড সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৩০, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, সন ১২৯৮ সাল।
২০. Subal Chandra Mitra : Iswar Chandra Vidysagar, Calcutta, 1909 "He was never seen to tell mantras or to worship a Hindu God or Goddess" p. 356.
২১. শম্ভুচন্দ্র : ঐ পৃষ্ঠা ১৩৯ ;
২২. দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর : স্বরচিত জীবন চরিত ; পৃঃ ৭

২৩. শম্ভুচন্দ্র : ঐ পৃষ্ঠা ১৪০
২৫. শম্ভুচন্দ্র : ঐ পৃষ্ঠা ৩০০
২৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৩০
২৭. শম্ভুচন্দ্র : ঐ, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫
২৮. বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৩৫৭
২৯. বিনয় ঘোষ : ঐ, পৃঃ ৫৪৮-৫৫৬।
৩০. বিপিন বিহারী গুপ্ত : ঐ পৃষ্ঠা ১৬৫
৩১. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
৩২. শম্ভুচন্দ্র : ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৭
৩৩. ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়এর "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ" (নবোদয় বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকায় ১৩৬২) প্রকাশিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইন্দ্র মিত্র ৩৪২
৩৪. শম্ভুচন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৩৩১-২৩২
৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী : মহাপুরুষের সান্নিধ্যে, ১৯৬৩ পৃষ্ঠা ২৪-২৬ ;
৩৬. চণ্ডীচরণ : ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬৬-৬৭ ;
৩৭. ইন্দ্রমিত্র : ঐ পৃষ্ঠা ৫৪৯, শশীভূষণ বসু রচিত বিদ্যাসাগর স্মৃতি নামক প্রবাসী শ্রাবণ (১৩৪৩) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।
৩৮. চণ্ডী চরণ : ঐ পৃঃ ৩৮ ;
৩৯. ক্ষুদিরাম বসু : ঐ, পৃঃ ৫৫৫ ;
৪০. চণ্ডী চরণ : ঐ, পৃঃ ৪০৫ ;
৪১. বিহারীলাল সরকার : ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৪ ;
৪২. চণ্ডীচরণ : ঐ পৃষ্ঠা ৪৬৮-৪৬৯, গান—

তুমি কোথায় ভুলে রয়েছে, নিরঞ্জন, নির্ণয় কর্ষে রে কে,
তুমি কোনখানে থাও কোথায় থাকরে, মন অটল হ'য়ে
কোথায় ভুলে রয়েছ—
তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী ; আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি
আপনি হও সে চড়ণদাররজি, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।

৪৫. এই একই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকেও সমান বিচলিত করেছিল। তাঁর মানসী কাব্য গ্রন্থের-'সিন্ধু তরঙ্গ' কবিতা এই ঘটনার স্মৃতিতেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির মূল সুর অবশ্য জীবন ও জড় জগতের চিরন্তন সংঘাত। তবু তিনিও একটি লাইনে বিদ্যাসাগরের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন ; "নাই তুমি ভগবান, নাই দয়া নাই প্রাণ, জড়ের বিলাপ"
৪৬, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঐ পৃঃ ১৪০-৪১ ;
৪৭. বিপিন বিহারী গুপ্ত : ঐ, পৃঃ ২৬৯-২৭০ ;
৪৮. বিনয় ঘোষ : ঐ, পৃঃ ৫৫৫ ,
৫১. এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন, "The reason is obvious. Ramakrishna's greatest disciple had in the meantime made systematic philanthropy, serving the 'Daridra Narayan', the central thrust of the Mission founded by him"
৫২. শ্রীম কথিত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, একাদশ পুনর্মুদ্রণ। ১৩৮৪, পৃঃ ১
৫৩. শ্রীম : ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭

অনুভব

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

সারা সকাল কাটল পাথর কুড়িয়ে। লাল, সবুজ, কালো, নীল, খয়েরি—নানা রঙের নানা মাপের পাথর। ব্রততীর ব্যাগ বোঝাই, তবু আশ মেটে না। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ী নদীর বঙ্কিম পথ অনুসরণ করে তারা বাংলো থেকে অনেক দূর চলে এসেছে।

তখন অনুপমের ইচ্ছে হচ্ছিল বালিতে শুয়ে চোখ বুজে নদীর গান শোনার। পাথর কুড়োনোয় তার কোন আকর্ষণ নেই। তবু, ব্রততীর ইচ্ছাপূরণে দীর্ঘকাল সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, নিজের ইচ্ছে চেপে সেও পাথর কুড়োচ্ছিল মন দিয়ে।

তারা যখন বাংলো থেকে বেরিয়েছিল তখন সবে ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা ছিল বেশ, ঝিরঝিরে হাওয়া ছিল। এখন ঝলমলে রোদ, গরম বালি পায়ের তলায়। শীতের পোশাক একে একে জমা পড়েছে রমেশের কাঁধে।

রমেশ হাসিমুখে তাদের অনুসরণ করছিল। হাসছিল সম্ভবতঃ তাদের ছেলেমানুষি দেখে। তারপর ক্লান্ত ব্রততী যখন নিজেই বলল, থাক বাবা, আর নয়, ঢের হয়েছে, তখন রমেশ বলল, সেই ভাল। আবার কাল খুঁজো।

—কাল কেন? আজই, বিকেলে আবার। আমাদের এখানে কাজ কী আর। ব্যাগটা রমেশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্রততী বলল।

—বেশ তাই হবে। রমেশ বলল। তারপর সে খানিক এগিয়ে নদীর বাঁকে একটা বড় পাথরের উপর উঠে দাঁড়িয়ে নদীর জলে ব্যাগ উপুড় করে সব পাথর ফেলে দিল। নদীর তীব্র জলস্রোতে টুটাং আওয়াজ তুলে পাথরগুলো নিমেষে উধাও।

ব্রততী আর অনুপম হতবাক।

—ফেলে দিলে?

—হ্যাঁ। বললে যে বিকেলে আবার কুড়োবে।

—বিকেলে খুঁজব বলে সকালে কুড়োনো পাথর ফেলে দিতে হয়!

বোকা না বদ! ক্ষোভে দুঃখে ব্রততীর চোখে জল। মুখ ফিরিয়ে সে দৌড়োল বাংলোর দিকে। চটি পরে শাড়ি-পরা মহিলার পক্ষে নদীর বালির ওপর দৌড়োনো সহজ কাজ নয়। একটু দূরেই ব্রততী মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর।

বিমল সান্যাল অবাক হয়ে ব্রততীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।—কী বললেন, কোথায় যাবেন? সিংলা-বাজার—গোখ! আর কিছু দেখার নেই, সব শেষ?

ছেলের জন্ম বছরে অন্ততঃ দুবার ব্রততী আর অনুপম দার্জিলিং আসে। সানদাকফু, ফালুট থেকে লোলেগাভ-লাভা অব্দি সব দেখা। একটা ফরেস্ট বাংলোই দেখা বাকি—গোখ।

ফরেস্ট অফিসার বিমল সান্যাল অনুপমের বাবার ছাত্র। সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত। সে সজোরে মাথা ঝাঁকায়।

—এত জায়গা থাকতে গোখ! ওটা একটা যাবার জায়গা হল? জঙ্গলে লোকে যায় কেন, জন্তু-জানোয়ার দেখতে অথবা নির্জনতার ডাকে। গোখে বাঘ ভালুক পাবেন না, পেতে পারেন শেয়াল-কুকুর। আর ঘাড়ের ওপর একটা ঘিনঘিনে শহর। বাংলোটাও তেমন ভাল নয়, জলের খুব সমস্যা। বাথরুম ভাল নেই, কিচেন নেই, আলো নেই। খুব অসুবিধে হবে আপনাদের।

ব্রততী বলেছিল, হলে হবে, সারাজীবন ত থাকতে হবে না। দু' একটা রাত।

—বেশ, তবে যান। ফিরে এসে বলবেন, কেমন লাগল। চেষ্টা করবেন দিনের আলো থাকতে থাকতে ওখানে পৌঁছোতে। ওখানকার চৌকিদারটাও তেমন সুবিধের নয়। ওর নামে অভিযোগ বহু।

সামান্য দেরি হয়েছিল পৌঁছোতে। সিংলাবাজার ছাড়িয়ে সামান্য এগোলে গোখ। জোঙ্গা তাদের বড় রাস্তার ওপর নামিয়ে চলে গেল জোড়থাং-এর দিকে। রাস্তা থেকে

বাংলোটা কাছের, বড় জোর আধা কিলোমিটার। জঙ্গলে পায়ে চলা নির্জন পথ, একটু গা ছমছম করে। তারপর বাংলো যদি বা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল না চৌকিদারকে। তাকে খুঁজে বার করতে লাগল আরও একটি ঘণ্টা। পিচ কালো অন্ধকার, ঝিঁঝিঁর ডাক, পাতার ফাঁকে ফিসফিসানি—সব মিলিয়ে প্রথম সন্ধ্যাটা বেশ ভয় জাগায় প্রাণে। রমেশকে পাওয়া গেল একটা ট্রাকের পাশে। ক্লিনার বা ঐ জাতীয় দুজন লোকের সঙ্গে বসে মদ গিলছিল। অনুপম তাকে বাংলো পাস আছে বলা সত্ত্বেও সে উঠছিল না, দেখতেও রাজি হচ্ছিল না। তার সঙ্গীরাই তাড়া দিয়ে ওঠাল তাকে। রমেশের বক্তব্য খুব সরল—সে লেখাপড়া জানে না, তাই শহরের লোক তাকে ঠকায়, উল্টোপাল্টা কাগজ দেখিয়ে বাংলোয় ঢোকে। সে আর ঠকবে না।

বহু চৌকিদার, বিশেষতঃ বয়স্ক যারা, অক্ষরজ্ঞানহীন। তার সুযোগ অনুপমও নিয়েছে বহুবার। এবার, সে যে সাচ্চা লোক তার প্রমাণ দিতে গলদঘর্ম অনুপম।

বিমল বলেছিল, জলের সমস্যা আছে। কিন্তু কে জানত যে এক ফোঁটা জলও থাকবে না। রমেশকে জলের কথা বলাতে সে বলতে শুরু করল, জলের সমস্যা মেটাতে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে বা নিতে চলেছে!

নেপালি ভাষা সামান্য জানা থাকায় সুবিধা হল। রমেশের বৌ সাবিত্রীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার কোয়ার্টার থেকে অনুপম এক বালতি জল সংগ্রহ করে আনল। ফিরে এসে দেখল, একটা বেডশিট আর দুটো বালিশ ছাড়া বিছানায় আর কিছু নেই।

—ব্যাপার কী রমেশ, তোষক কোথায়, কম্বল কৈ, ঠাণ্ডায় মরে যাব যে।

—সে সব আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। নির্বিকার রমেশ। দুটো গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, মানুষ অত সহজে মরে না। কত কষ্ট কত দুঃখ সয়ে সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ বেঁচে আছে। কম্বল তোষক ছাড়া কত লোক এই দুনিয়ায় রাত কাটাচ্ছে। কেউ নালিশ করছে? সব কিছুই মানিয়ে নিতে হয়।

জঙ্গলে অনুপমরা দর্শনের পাঠ নিতে আসেনি, এসেছে বেড়াতে, দুটো দিন ব্রেক আনন্দে কাটাতে। অনুপম ভীষণ রেগে বলেছিল, ফিরে গিয়ে বড় সাহেবের কাছে তোমার নামে নালিশ করব। ভিজিটরদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার, রক্সি খেয়ে মাতলামো—সব বলব।

শত ধমকেও নেশা কাটেনি তার। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটেছিল মুখে। কম্বল যে জুটেছিল শেষ পর্যন্ত সে সাবিত্রীর কৃপা। শুধু একবার বলল, নালিশ করো না। নালিশ করে শাস্তি মেলে না। এই দেখো, আমি কেমন শাস্তিতে আছি, আমার কোন নালিশ নেই।

সকাল থেকে রমেশ কতবার যে ক্ষমা চেয়েছে কাল রাতের আচরণের জন্য। বাথরুমে স্নানের জল, ফিল্টারে খাবার জল, রান্নার জন্য কাঠ, কেরোসিন, চা, জলখাবার। আজ তাকে কিছু বলতে হচ্ছে না, একের পর এক সে করে চলেছে হাসিমুখে। আর মাঝে মাঝে ব্রততীর সামনে এসে হাতজোড় করে কোমর ঝুঁকিয়ে বলে যাচ্ছে, ক্ষমা করো মেমসাব।

চেহারা দেখে মনে হয় রমেশের বয়স বছর পঞ্চাশ। মুখে কপালে গলায় সরু-মোটা বহুশত ভাঁজ। পরনে খাকি শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট হাঁটু অব্দি, কোমরে গোঁজা কুকরি, মাথায় উলের টুপি, পায়ে জুতো-মোজা। যদিও দিনের বেলা বেশ গরম।

—কাল ওরা জোর করে আমাকে পাইয়ে দিল। তাইতে মাথাটা কেমন বিগড়ে ছিল।

—আর আজ? আজ কেন পাথরগুলো ভাসিয়ে দিলে জলে? কত যত্ন করে সংগ্রহ করেছিলাম।

—দুঃখ কোর না মেমসাব। তোমাদের যাবার দিনে এই এত পাথর তোমায় দেব। এত পাথর, এমন পাথর তুমি বইতে গেলে হাঁফিয়ে উঠবে।

—তুমি ওগুলো ফেলে দিলে কেন তাই বলো।—ব্রততী ছাড়বে না। জবাব তার চাই।

রমেশ হেসে বলল, যারা এখানে আসে তারা সকলেই পাথর কুড়োয়। শেষে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, এখানেই ফেলে যায়। আমার বেশ লাগে নদীর জলে ভেসে আসা পাথর নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে। জলে পড়া মাত্র কেমন টুংটাং শব্দ হয়, যেন শত শত কাচের চুড়ি আছড়ে ভাঙছে কেউ। আর জলের ধারা কেমন এলোমেলো হয়—দেখো নি? দেখো, মজা পাবে।—খেলাটা শিখিয়েছিল একজন, অনেকদিন আগে। সে যে কোথায় চলে গেল।

ব্রততী আর অনুপম একে অন্যের দিকে তাকায়। কে শিখিয়ে ছিল তাকে এই খেলা, কোথায় চলে গেল! রমেশ হি হি করে হেসে উঠল। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলে গেল। কাল সন্ধ্যায় লোকটাকে মনে হয়েছিল শয়তান

মাতাল—আজ মনে হল পাগল, নয়ত কবি।

তারা ভেবেছিল দুপুরের গাড়িতে দার্জিলিং ফিরে যাবে। তা আর হল না। রমেশের আন্তরিকতা, সরল মনমাতানো হাসি দেখে তাকে ক্ষমা না করে পারা যায় নাকি? ক্ষমা করলে আর যাওয়াই বা কেন? জায়গাটা ত দেখা হয়নি।

রমেশ বার বার বলেছে, না মেমসাব, তোমরা যাবে না, থাকো, আর ভুল হবে না। তোমরা আজ থাকো, কাল থাকো, পরশু থাকো—যতদিন খুশি থাকো। অন্য লোক এসে পড়লে তোমাদের আমি আমার কোয়ার্টারে রাখব। এমন সুন্দর জায়গা না দেখে চলে যাবে কেন?

এ এক অন্য রমেশ। বরং আজ ভোগাচ্ছে তার বৌ। কেরোসিনের সন্ধানে রমেশ বেরোনোর সাথে সাথে সাবিত্রী জল ফেলে ফিল্টারটা আলমারিতে ঢুকিয়ে ফেলল। বারান্দা ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটা ছুঁড়ে ফেলল নিচে, ঘর ঝাঁট দিল না। রান্না বানানোর কথা বলায় ব্রততীকে ধমক দিয়ে বলল, সঙ্গে বাবুর্চি আনো নি কেন?

অথচ কাল রাতে সাবিত্রীকেই মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। রমেশ বলল, ও এরকমই। আমি ওর চোখের আড়ালে গেলেই ক্ষেপে ওঠে। চিৎকার করে, জিনিসপত্র ছোঁড়ে, কান্নাকাটিও করে। কেন যে কাঁদে, এ-দুনিয়ায় কান্নার কী দাম আছে? কিন্তু ও বুঝবে না। ও ভাবে বুঝি দুনিয়ায় ঐই একমাত্র দুঃখী। বিচারা!

একটা নয়, গোখ বাংলোয় দুটো পাগল!

বাংলোটার সারা অঙ্গে অযত্নের ছাপ। হাত পাঁচেক উঁচু কয়েকটা কাঠের খুঁটির উপর বাংলো, কাঠের সিঁড়ি। নড়বড়ে, ঝাওলা ধরা। উঠেই সরু এক ফালি বারান্দা। মাত্র একখানা ঘর, ঘরটা অবশ্য বেশ বড়, পাঁচ কোণা। এক পাশে বাথরুম। বিমল সান্যাল ঠিকই বলেছিল, বাংলোটা সুবিধের নয়। বিমল যা বলেনি তা হল, বাংলোর দক্ষিণ দিকের জানালাটা। লম্বা ভারি পর্দা টেনে সরিয়ে দেওয়া মাত্র জগৎ বদলে যায়। জানালার গায়ে কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছ, গাছের ফাঁকে উঁকি মারে রঙ্গীত আর লিট্‌ল্ রঙ্গিত—দুটো নদীর মিলনভূমি। পাহাড়ের স্নেহচ্ছায়ায় আলোয় ছায়ায় দুটো পাহাড়ী নদীর খেলা বিরামহীন, দেখে দেখে আশ মেটে না।

রঙ্গিতের এক তীরে পশ্চিম বাংলা, অন্য তীরে সিকিমের জেলা শহর জোড়থাং। তেমন বড় শহর নয়। তবে এ পারের প্রায় জনহীন গোখ থেকে ওপারের কর্মব্যস্ত জনবহুল শহরটাকে দেখলে মনে হয় যেন অবাস্তব। রাতে আলো ঝলমল জোড়থাং দেখে নাগরিক-মন কিছুটা ভরসা পায়।

স্নান করে, নাস্তা সেরে অনুপমরা বেরোল, সঙ্গে রমেশ। দুপুরের খাওয়া জোড়থাং-এ।

দোকান বাজারের জন্য এ পারের মানুষ হামেশাই ওপারে যায়। বাঁধানো রাস্তা গেছে এপার থেকে ওপারে ঝুলো সেতু ডিঙিয়ে। ও পথে খানিকটা ঘুরতে হয়। স্থানীয় লোক এ সময় রঙ্গীত পার হয় হেঁটে। পাহাড়ী নদী, হিমশীতলা, খরস্রোতা। হাঁটুজল—তবু ভয় করে, পায়ের তলায় একটি পাথরও যদি সরে যায়! রমেশ ব্রততীকে সাহায্য করে। তার সাহায্য নিতে অনুপমের লজ্জা লাগে।

জোড়থাং ভ্রমণ বিলাসীদের আকর্ষণ করে না। তেমন বড় শহর নয়। গায়ে গায়ে লোকজন, বাড়ি, দোকান, হৈ চৈ, হাঁকাহাঁকি। অনেকটা জায়গা জুড়ে দোকান।

অনুপম প্রচুর বাজার করল আর হুইস্কি নিল। নিজের জন্য ব্যাগ-পাইপার, রমেশের জন্য সিকিম গোল্ড স্টার।

—আজ আর কষ্ট করতে হবে না, তাই ত রমেশ?

—আরে না না। জিভ কেটে বলল রমেশ, তোমরা অতিথি, অতিথিকে কষ্ট দেওয়া পাপ।

সারাদিন পাহাড়ের গা থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে বালি, পাথর মাটি। কখনও ধ্বস নামে। রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ হয় প্রায় সারা বছর। জঙ্গলের কোলে চাষবাস হয়। নীল আকাশ, সবুজ বনাঞ্চল। নদীর জলেও সবুজ আর নীলের গুঁড়ো। আকাশে বাতাসে এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ ছড়িয়ে থাকে যাকে ছোঁওয়া যায় না, নদীর চাপল্যও তাকে ভাঙতে পারে না। আছে এক বিচিত্র শূন্যতা যা পূরণ করা বুঝি সম্ভব নয়, প্রকৃতির অভিলাষও তাই যেন।

ফেরার পথে রমেশ বলল, এই জঙ্গলে অনেক পাখি আছে।

—কী পাখি, কেমন দেখতে?

—আমি তাদের নাম জানি না। হরেক রকম পাখি—কালো, নীল, হলুদ, সবুজ, ছোট বড়—অনেক, অনেক।

জঙ্গলের ছায়া বড় হতে হতে ঢেকে ফেলল নদী, পাহাড়। দিন ফুরোল পাখির খোঁজে।—কোথায় পাখি?

ক্লান্ত বিরক্ত ব্রততীর প্রশ্ন শুনে রমেশ বিজ্ঞজনের মত মাথা দুলিয়ে বলল, আছে, নিশ্চয়ই আছে। পাখি ত হারায় না, মানুষ হারায়। তবে ধৈর্য থাকলে হারানো মানুষও

খুঁজে পাওয়া যায়, পাখি পাওয়া যাবে না?

যায় না। পাখি আছে কি আদৌ, না কি সবটাই রমেশের কল্পনা!

নদীর ধারে এসে রমেশ আচমকা ব্রততীকে কোলে তুলে নেয়। গোড়ায় লজ্জা পেলেও, পর মুহূর্তে মজা পেয়ে হেসে ওঠে ব্রততী। অনুপমের ভয় হয়—পাগলকে বিশ্বাস কী, যদি স্রোতের মুখে খেলাচ্ছলে ব্রততীকে ছেড়ে দেয়!

সন্ধ্যার পর অনুপম হুইস্কি নিয়ে বসে। রমেশকেও ডেকে নেয়। কী জানি যদি অন্য আসরে চলে যায়। ব্রততীর ভয় সাবিত্রীকে নিয়ে। কখন বলবে, হবে না তোমাদের রান্না, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করো।

সকালে একবার সাবিত্রী উদ্বনে জল ঢেলে দিয়েছিল।

সাবিত্রী নিজে এসে বলল ব্রততীকে, চল আমার ঘরে। ওখানে গল্প করতে করতে তোমাদের রান্না করে দেব।

তেমন কিছু দূর নয় রমেশের কোয়ার্টার। তবু জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার পথ। একটু ইতস্তত: করছিল ব্রততী। অনুপম বলল, যাও, যাও না বাবা, যা বলছে শোন। কখন আবার মুড যাবে বিগড়ে।

গিয়েও খানিক পরে ব্রততী ফিরে এল, মাথা ধরেছে এই অজুহাতে। সাবিত্রী কী একটা ওষুধও এনে দিল।

রঙ্গীম আর রঙ্গিতের মত ভয় আর আনন্দের ছুটো স্রোত সারাদিন মিশে থাকে মনে। তবু ত ছুটো দিন কাটল বেশ। দ্বিতীয় দিন ত প্রায় নির্ঝঞ্ঝাটে। একবারই রমেশ তার তীব্র কর্তব্যবোধের তাড়নায় অথবা মমত্বের কারণে স্থানীয় একজনের সঙ্গে তুমুল তর্ক বাধিয়েছিল। লোকটার ছাগল বাংলো সংলগ্ন ফুলের গাছ নষ্ট করে গেছে। কী সাংঘাতিক রাগ রমেশের। লোকটার দিকে খালি হুইস্কির বোতল ছুঁড়েছিল। নিশানা গলদ, তাইতে রক্ষা!

দ্বিতীয় দিনও পাখির দর্শন মেলেনি। দেগা গেছে কিছু প্রজাপতি আর ফড়িং। তবে আওয়াজ শোনা গেছে। নিঝুম জঙ্গলে গড়িয়ে যাওয়া পাথরের শব্দও ত মধুর লাগে, তাই, কী পাখি বোঝা যায়নি। পাখিই যে তা কে জানে।

রমেশ বলল, মনে ভরসা রাখো, ছটফট করলেও হবে না, হাহুতাশ করলেও হবে না। চাই ধৈর্য, মনের জোর।

দার্জিলিং যাবার গাড়ি সকাল সাতটায়, জোড়থাং থেকে ছাড়ে। মালপত্র কাঁধে তুলে নেয় রমেশ। নানা রঙের ভারি সুন্দর সুন্দর নুড়িপাথর রমেশ ভরে দিয়েছে ব্রততীর ব্যাগে। ব্রততী দারুণ খুশি। সাবিত্রী আসে তালা ঝোলাতে। তার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দেয় ব্রততী। অনুপম শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল নদী, পাহাড়, জঙ্গল বাংলোর জানালা থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে। পাহাড় অনেক দেখা, গ্রামও। কিন্তু এমন সুন্দর পাহাড়ী গ্রাম অনুপম দেখেনি আগে। শোনেনি কখনও দুই নদীর যুগলবন্দী। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তারা শুধু উপভোগ করেছে তা নয়, অনুভবও করেছে যেন কিছুটা। প্রকৃতি শুধু নয়, মানুষও তাদের মুগ্ধ করেছে। এখানে ছুটো নদী, তবু মানুষকে কী পরিশ্রম করতে হয় জলের জন্য, চাষবাস বেশ শ্রমসাধ্য, কাজের সুযোগ সীমিত। তবু এখানে মানুষ হাসে, গান গায়, নুড়ি পাথর নিয়ে খেলে, পাখির খোঁজ রাখে।

অনুপম বলল, আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে পারলে মন্দ হত না।

সাবিত্রী হেসে বলল, কয়েকটা দিন কেন, বরাবরের জন্য থেকে যাও। এখানেই একটা বাড়ি বানিয়ে নেবে। শহরের জন্য মন খারাপ করলে চলে যাবে জোড়থাং কি দার্জিলিং।

—ভাবতে ভালই লাগছে, ব্রততী বলল।

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রমেশ বলল, তাহলে থাকো। আজ দুপুরে আমি নিজে তোমাদের রান্না করে খাওয়াব। ইসখুশ আর ফাকসা। আমি এখুনি নিয়ে আসছি। আর খাওয়া দাওয়ার পর তোমাদের নিয়ে যাব আজ আর এক জায়গায়। সেখানে জঙ্গল আরও ঘন আর নিঝুম, ঝর্নার জলে মাছেরা খেলা করে।

রমেশের পিঠে হাত রেখে অনুপম বলল, এবার নয়, পরের বার। কাল আমাদের ছেলে আসছে, তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরব। আজ দার্জিলিং তাই ফিরতেই হবে।

অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রমেশ কী দেখল কে জানে। আবার কাঁধে সে ব্যাগ তুলল। তার উৎসাহ নিভে গেছে।—তাহলে আর দেরি নয়, চল এখুনি।

ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু এমন রূঢ়ভাবে বলল!

সাবিত্রী বলল, তোমরা বুঝি কলকাতার লোক।

অনুপমের বাড়ি সোদপুর। তা সোদপুরের নাম কে জানে এ তল্লাটে। তাই সে বলল, হ্যাঁ।

সাবিত্রী ছেলেমানুষের মত আছুরে গলায় বলল, আমাকে নিয়ে যাবে কলকাতায়? আমি কখনও কলকাতা দেখিনি।

—তা বেশ ত, চল। কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কলকাতা কি ভাল লাগবে তোমার? ওখানে কত হৈচৈ,

ধোঁয়া, ধুলো, এত গাছপালা জঙ্গল নেই, এমন সুন্দর পাহাড় নেই, আকাশ মোটেই নীল নয়। আছে একটা ঘোলাজলের নদী আর প্যাচপেচে গরম।

—তা হোক। আমি শুধু একবার দেখতে চাই। তোমরা একটু দাঁড়াও।

বলেই সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে দৌড়ল তার কোয়ার্টারের দিকে। রমেশ বলল, কী করলে, বুড়ি যে নেচে উঠল, সামলাবে কে? তোমরা ত জান, বুড়ি আমার কেমন খ্যাপা।

অনুপম বিব্রত, ভেবে পেল না তার কী করা উচিত। ব্রততী চাপা গলায় বলল, হল ত? সামলাও এখন। এই পাগলিকে নিয়ে কোথায় যাবে, কী করবে? স্রেফ অকারণে জট পাকালে। দার্জিলিং-এ ও থাকবে কোথায়? আমাদের সাথে হোটেলে? ওফ্। তারপর কলকাতায়—

—আঃ, ব্যস্ত হোয়ো না ত, দেখ না কী হয়। নিছক একটা কেঠো ভদ্রতা করেছিলাম, তা যে এমন সিরিয়স হবে কে ভেবেছিল।

—সাবিত্রীর সঙ্গে কেঠো ভদ্রতারও কি কোনও প্রয়োজন ছিল? সেই সম্পর্ক নাকি? চৌকিদারের বৌ, ছিলাম দুদিন, কিছু বখশিস দিলাম, ফুরিয়ে গেল। তা নয়—

অনুপম সিগারেট বার করে ধরাল। পাতার ফাঁক গলে সূর্যের নরম আলো এসে পড়েছে তার পায়ের কাছে শুকনো পাতার ওপরে। জুতোর ডগা দিয়ে অনুপম অকারণে শব্দ তুলে পাতা ভাঙল।

—এক কাজ করো, ব্রততী বলল, খুব বায়না করলে ওর হাতে না হয় আরও কিছু টাকা গুঁজে দিয়ো। বাড়ি নেওয়া ত দূরের কথা, ওকে দার্জিলিং-ও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বি প্র্যাকটিকাল।

—সেই ভাল। তাতেও যদি সুবিধে না হয় ডুজু দিয়ে কেটে পড়ব। কিছু ভেবো না, ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে।

খানিকক্ষণ পরে রমেশ ফিরে এল। মুখে তার ম্লান হাসির রেখা। পেছনে সাবিত্রী। সাবিত্রীর পোশাক বদল হয়নি, হাতে কোন ব্যাগ বা পোটলা নেই। সে যে সঙ্গ নেবে না বোঝাই যাচ্ছে, তবু অনুপম বা ব্রততী তাকে সাহস করে আর কিছু জিগ্যেস করল না, করতে পারল না। তারা সবাই হাঁটতে শুরু করল। সবার আগে রমেশ, তারপর সাবিত্রী, সবার পেছনে অনুপম আর ব্রততী। গোড়ায় ধীর লয়ে, পরে দ্রুত বেগে হাঁটতে থাকে রমেশ এবং সে কারণে অন্য সকলে। বেলা বাড়ছে। প্রথম গাড়ি নিশ্চয়ই ভর্তি হয়ে গেছে, অন্তত দ্বিতীয় গাড়িটা ধরতে হবে। সাবিত্রী মাঝে মাঝেই চোখের জল মুছছে আর বলছে এই বুড়োর জন্য কোথাও যাওয়া হবে না আমার। কোথাও যেতে দেয় না।

বড় নিশ্চিন্ত এখন অনুপম ও ব্রততী। কোন ভুজুং দিয়ে কেটে পড়ার প্রয়োজন নেই, হাতে আরও কিছু গুঁজে দেবারও প্রয়োজন নেই। তবু আর ঠাট্টা বা ভদ্রতা করেও কোন বেফাঁস কথা নয়। জঙ্গলের পথে আলো-ছায়ার মন-জুড়োনো নক্সা দেখে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে।

জোড়থাং-এর পথে দ্বিতীয় ও শেষ সেতুর মাঝামাঝি এসে ফিরে দাঁড়াল সাবিত্রী।

—তোমরা আমার একটা কাজ করে দেবে?

ব্রততী ও অনুপম পরস্পরের দিকে তাকায়। আর কোন ঝুঁকি নেওয়া নেই। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে রমেশ বলল, বলো, শুনি আগে কী কাজ?

সাবিত্রী কোন কথা না বলে এবার তার হাতের তালু মেলে ধরল। কালো-সাদা, পাসপোর্ট সাইজের পুরোনো জীর্ণ একটা ছবি, দু তিনটে ভাঁজ। বছর বারো বয়সের কোন মেয়ের। নরম লাজুক দৃষ্টি, মিষ্টি হাসি। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে ব্রততী বলল, কার ছবি?

—আমার মেয়ে রাধার।

—তাই নাকি, কী সুন্দর গো! কিন্তু তাকে ত দেখলাম না একবারও। এখানে থাকে না বুঝি?

শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল সাবিত্রী, না। সে আছে কলকাতায়। সাত বছর আগে এক বাবু কাজের লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল। মেয়ে আর ফিরল না। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পার দাজু?

সাত বছর যে বাড়ি ফেরেনি একবারের জন্যও, তাকে পাবে কোথায় যে ধরে ফিরিয়ে আনবে! অনুপম বলল, আচ্ছা চেষ্টা করে দেখব, ঠিকানা দাও।

সাবিত্রীর চোখে তখন রঙ্গিতের তীব্র স্রোত। ব্রততীর বুঝতে একটুও দেরি হল না। সে জড়িয়ে ধরল সাবিত্রীকে। সীমান্ত সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্রততীর বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল সাবিত্রী। ধমক বা বখশিস বা মিথ্যে সান্ত্বনায় থামার নয় সে কান্না। আর এই কান্নার সামনে দাঁড়িয়ে অনুপমের মনে হল নিজেকে কী অসহায়, নিরবলম্ব।

ব্রততীর মনে হল, কী আশ্চর্য এক প্রজাতি এই মানুষ! কোন প্রত্যন্ত প্রদেশ অবধি প্রসারিত তার লোভের হাত। তারা কেউ সাবিত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও করল না।

রমেশ বলল অনুপমকে, দাজু, আজ বুড়ি বেশ খেপেছে। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি আর যেতে পারব না।

তারপর সে সাবিত্রীর কাছে গিয়ে তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, কাঁদিস না। চল আমরা ফিরে যাই।

সত্যি ত কিছু করার নেই এবং ফিরতে যখন হবেই। অনুপম কাঁধে তুলে নিল ব্যাগ। চোখের ইশারায় ডাকল ব্রততীকে। ব্রততী বলল, আচ্ছা রমেশ, আমরা তাহলে— কথা শেষ করতে পারল না সে, আঁচল টেনে মুখ ঢাকল।

অনুপম বলল, সাবিত্রী তুমি আর কেঁদো না। আমি খুঁজে বার করব তোমার মেয়েকে, ছবিটা দাও।

কান্না থামাল বটে, কিন্তু ছবি সে দিল না। ছবিও যদি দিয়ে দেয় ত আর থাকল কী তার।

রমেশ বলল, সাহেবকে বোলো, জল নেই, আলো নেই এমন ভাঙাচোরা বাংলোয় আর লোক কেন পাঠায়। আমাদেরও কষ্ট, যারা আসে তাদেরও কষ্ট। একটু বুঝিয়ে বোলো।

ক্লান্ত অবসন্ন একজন রমেশ ছেত্রী তার 'বুড়ি' হাত ধরে, আর একটিও সান্ত্বনা-বাক্য উচ্চারণ করে না। সেতু পেরিয়ে বাঁধানো সড়ক ছেড়ে নেমে যায় নদীর দিকে 'চোরাবাটো' ধরে। অনুপম অবাক হয়ে ভাবে এই সেই রমেশ যে নাকি কালও তাকে বুঝিয়েছে, হতাশ হয়ো না, ধৈর্য ধরো।

কাজী আবদুল ওদুদ : জীবন ও সাহিত্য কর্ম

শহিদুল ইসলাম

ভূমিকা

কথা সাহিত্যিক হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যিক জীবন শুরু হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে। কাজী ওদুদ প্রকৃত অর্থেই ভাবুক, চিন্তাবিদ ও জীবন দার্শনিক। দুটি উপন্যাস, গোটা আষ্টেক গল্প এবং একটি নাটক লেখা ছাড়া তিনি সৃজনশীল সাহিত্যের পথ আর মাড়ান নি। কিন্তু তাঁর ১৮টি গ্রন্থে প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন অসংখ্য, তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যেও ভরপুর। তাঁর সেই বিশাল চিন্তার জগতে দৃষ্টি না দিলে তিনি অনেকটাই অপরিচিত থেকে যান। 'কবিগুরু গ্যেটে' ও 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে'র অন্তর্জীবনের পরিচয় লাভই যেমন ছিল ওদুদের 'কাঙ্ক্ষিততম' উদ্দেশ্য, ব্যক্তি ওদুদের যে মূল চিন্তাটি আমৃত্যু ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল তাঁর অন্তরে, সেটির সন্ধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। 'একজন খাঁটিয়ে সাহিত্যিকের কথা' যাঁর আত্মজীবনীর নাম, তিনি সত্যিই একজন খাঁটিয়ে কর্মী—পরিশ্রমী সমাজ সংস্কারক। তিনি অনেক বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন কিন্তু সব লেখার মধ্যেই উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের প্রতি তাঁর অশেষ মমতাবোধ ও অক্ষুণ্ণ আস্থা লক্ষণীয়। এক কথায় তাঁকে রেনেসাঁসবাদী বললে ভুল বলা হবে না। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি চোখে পড়ে, সেটাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তা হল, স্বীয়সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 'রেনেসাঁসহীনতায়' তাঁর মনঃপীড়া। তবে মনোকষ্ট পেয়েই তিনি বসে থাকেন নি। ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে সারাজীবন 'রেনেসাঁসের' বাণী প্রচার করেছেন শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। কোরান-হাদিসের বাইরে যাদের চোখ যায় না, কোরান-হাদিস দিয়েই তাদের ঘায়েল করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি দয়ামায়াহীন, সবল প্রতিপক্ষের প্রতি আপোসহীন। এসব বাদ দিয়ে ওদুদের মূল্যায়ন সত্যিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ওদুদকে নিয়ে ভাববার সময় তাঁর ভাবনা-চিন্তা-জীবনাদর্শ সামনে রাখা দরকার এবং সেই জীবনাদর্শের আয়নায় নিজেদের বর্তমান চেহারাটা একবার দেখা দরকার। প্রবন্ধের শুরুতেই এই ছোট্ট ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল এ কারণে যে ওদুদের আলোচনায় আমি তাঁর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্বারোপ করতে চাই, প্রথমেই তার সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছি।

জীবনী

ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামের একটি বনেদী কিন্তু সঙ্গতিহীন পরিবারে কাজী ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৯ এপ্রিল। কৃষিনির্ভর পরিবার। বাবা কাজী সগীর-উদ্দীন ছিলেন রেলের স্টেশন মাস্টার। বিভিন্ন স্টেশনে চাকরি করে ১৯২২ সালে হাওড়ার স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে মৃত্যুবরণ করেন। মামার বাড়িতে থেকে ওদুদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৩ সালে ১০ টাকার বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা, ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন। ১৯২০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান। খেলাফত, অসহযোগ আন্দোলন ও 'জাঁ ক্রিসতফ' উপন্যাসখানি ওদুদের সাহিত্যিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শিল্পী ওদুদ পরিণত হন 'জীবন জিজ্ঞাসু' ওদুদে। দীর্ঘ কুড়ি বছর শিক্ষকতার পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক হিসেবে কলকাতায় আগমন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধানের পদ গ্রহণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে থাকাই নিরাপদ মনে করেন। বিশের দশকে 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাই বলে দেয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনা সমৃদ্ধ বড় মাপের কোনও মানুষকে ধারণ

করার ক্ষমতা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেই। তাঁর সে সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসই তার বড় প্রমাণ। পাকিস্তানে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ হয়েছে স্তব্ধ। কুরৎ-উল-আইন হায়দার, সৈয়দ মুজতবা আলী পাকিস্তানে টিঁকতে পারেন নি। তাই ওদুদের মৃত্যুর পর অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছিলেন "তাঁর মত মানুষের পক্ষে পাকিস্তান হতো গোরস্থান।" কথাটা যে কত বড় সত্যি আমরা যারা পাকিস্তানী প্রজন্ম তারা ভাল-ভাবেই বুঝেছি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশে এলে ওদুদকে অবশ্যই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হতে হত, কারণ তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ কখনই সমর্থন করতে পারেন নি। পাকিস্তানে বসে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' লেখা সম্ভব হত কিনা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের সে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। 'কবিগুরু গ্যেটে' লেখার পর প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ লিখেছিলেন "পনের বছর থেকে মুসলিম সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে লিখলে তিনি হয়ত আমাদের জন্য একটা স্মরণীয় কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।" পনের বছর বছর খেটে গ্যেটে লেখার এই প্রতিক্রিয়া। 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রকাশের পরও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল পত্র পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে ঢের লিখেছিল। তার জবাবও দিয়েছিলেন ওদুদ। ১৯৫১ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন এবং পুরো সময় লেখার কাজে নিয়োগ করেন। ১৯৭০ সালের ১৯ মে এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

সৃজনশীল সাহিত্য

তাঁর প্রথম রচনা 'বিরাজ বৌ'-এর সমালোচনা ছাপা হয় 'ভারতবর্ষে'র চৈত্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। এম. এ. পড়ার সময়ই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মীর পরিবার' (১৩২৫) এবং প্রথম উপন্যাস 'নদীবক্ষে' (১৩২৬) প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র, শশাঙ্কমোহন সেন, এমদাদ আলী, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানান। এম. এ. পাশের পর ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' বাড়িতে কিছুকাল বসবাস কালে কাজী নজরুল ইসলাম, মোজফফর আহমেদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ প্রমুখ সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর একমাত্র নাটক 'খাঁ ও বিপথ' (১৩৪৬)-এ 'কোনটি জীবনের পথ আর কোনটি মৃত্যুর' পথ তা নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সেই সময়ের হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তিনি অখণ্ড ভারতের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস 'আজাদ' (১৯৪৮) লিখতে শুরু করেন বিশের দশকেই। অসহযোগ আন্দোলন ও 'জাঁ ক্রিসতফ' উপন্যাসখানি তাঁর 'আজাদ' লেখার প্রেরণা জগিয়েছিল।

মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য

জীবন জিজ্ঞাসাই ওদুদের মনকে আমৃত্যু সক্রিয় রেখেছিল। তাঁর বিশাল প্রবন্ধের সমারোহের যেমন সীমা নেই, তেমনি নেই জিজ্ঞাসার বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনও অঞ্চল নেই, যেখানে তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি পড়ে নি। সমকালের সব কিছুই তাঁর বিচারাধীন হয়েছে এবং তাঁর encylopaedic প্রতিভার সাহায্যে সে সবের চুলচেরা বিচার করে রায় ব্যক্ত করতে তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হন নি। মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার প্রতি তিনি যেমন ছিলেন নির্দয়, তেমনি পাশের বৃহত্তর ও অগ্রসর হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও কূপমণ্ডুকতাকেও আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। ওদুদ চিন্তায় ছিলেন মুক্ত ও সংস্কারহীন, তেমনি তার প্রকাশও ছিল অকপট ও নির্ভীক। তাই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তাঁর ৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'নব পর্যায়' বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিতর্কের ঝড় তোলে। এর পর ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'নব পর্যায়' ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর' ১৩৩১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ওদুদ রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তা 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর রায় সহ অনেকে লেখক-কে অভিনন্দন জানান। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রকাশ পেলে অনেকের সঙ্গে আব্দুল কাদির ও চারুচন্দ্র দত্ত বইটি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় লেখকের পক্ষপাতহীন সত্যকথা বলার প্রশংসা করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে নিজামের এক লক্ষ টাকা দানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে 'মুসলিম সংস্কৃতি' কেন্দ্র স্থাপন করে 'নিজাম বক্তৃতা'র প্রবর্তন করেন এবং কাজী ওদুদকে প্রথম বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। বিষয়টি ছিল সেযুগের (এ যুগেরও) জটিলতম সমস্যা 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ'। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯, ২৭ ও ২৮ মার্চ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ওদুদ সেই বক্তৃতা দেন। অনেক কিছুর সঙ্গে ওদুদ গান্ধীর 'মুসলমান গুণ্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ'

এই বক্তব্যও খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে গুণ্ডামির ভাব ও কাপুরুষতার লক্ষণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে উপস্থিত। সে বক্তৃতায় ওহাবী আন্দোলনকে মুসলমানদের পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ বলে প্রমাণ করেন। কেননা সে আন্দোলন ছিল অতীতমুখী। যখন রেনেসাঁসে অবগাহন ছিল অত্যন্ত জরুরি তখন ওহাবী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় 'উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী চেতনা আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জিত হচ্ছে।'

১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে 'আজকের কথা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সনে। প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলার মুসলমান'-এ আঠার শতককে তিনি ভারতীয় মুসলমানের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতক বলে চিহ্নিত করেন। কারণ 'মধ্যযুগে মুসলমান বিজয়ের প্রভাবে হিন্দু সমাজে দেখা দিয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের অভাব ও ধর্মাচারের আধিক্য, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ বিজয়ের প্রভাবে মুসলমান সমাজে দেখা দিল নৈরাশ্য ও মাত্রাতিরিক্ত ধর্মাচার প্রীতি।' ধর্মনাশের ভয়ে ও ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানরা দীর্ঘদিন ইংরেজি শিখতে এগুলোই না। তারা বুঁদ হয়ে ছিল অষ্টম শতাব্দীর ইমাম আবু হানিফার বিচার বাদের মধ্যে "কোরআনের কোনো উক্তি সম্বন্ধে 'কেন'—এই প্রশ্ন করা চলবে না।" কোরআনে যা আছে, যেভাবে আছে, তাই-ই মানতে হবে।' ওদুদ একে বিচার বিরোধী মত বলে চিহ্নিত করেন। শেষ প্রবন্ধে ওদুদ প্রশ্ন রাখেন "মুসলমানদের কাছে কোনটি আজ তাদের গতিপথ—সুলতান মাহমুদের না আলবেরুনীর ?"

১৩৩৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে ওদুদ গোটে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি পড়েন, তারই পরিবর্ধিতরূপ 'কবিগুরু গোটে' নামে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। লেখকের কথায়, "বাংলার একালের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে গোটের যোগ নিবিড়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের যে নব মানবিকতার সাধনা—New Humanism—পাশ্চাত্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল গোটে আর প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যার ব্যাপকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে।" বাঙলা ভাষায় গোটের উপর এমন অসাধারণ গ্রন্থ আর রচিত হয়েছে, মনে হয় না। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নজরুল প্রতিভা'। ৩টি প্রবন্ধের এই বইটির দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'প্রতীক প্রীতি'তে "নজরুল প্রতিভায় একই সঙ্গে ইসলাম প্রীতি আর প্রতীক প্রীতি কেন দেখা দিল' তার বিচার করে ওদুদ কবির 'প্রতীক প্রীতিকে' রেনেসাঁস ধর্মী বলে মনে করেন। এরপর ১৯৫০ সালে 'Creative Bengal', ১৯৫১ সালে 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' ও ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে তাঁর বহুলপ্রশংসিত ও পঠিত 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রকাশ পায়। 'শাশ্বত বঙ্গের' মত বই পাকিস্তান থেকে কখনও প্রকাশিত না হওয়াই প্রমাণ করে যে পাকিস্তানে গেলে ওদুদের ভাগ্যে কী জুটত? বইটির 'নিবেদনে' লেখক অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে দেশভাগকে কী চোখে দেখেছেন, তা উল্লেখ করতে ইতস্তত করেন নি।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা সংকলিত হয়ে 'বাংলার জাগরণ' নামে প্রকাশ পায় ১৩৬৩ সনের পৌষে। উনিশশতকের বাংলার জাগরণকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এ গ্রন্থে। জাগরণের অর্থ তাঁর কাছে "পরকালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিল, তখন সূচিত হয়েছিল রেনেসাঁস।" জীবন সম্বন্ধে মানুষ নতুন আশা আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে, প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলা নবজীবন লাভ করে এবং ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে জাগে নবতর চেতনা। নবজন্মের দৃষ্টিতে তখন সবকিছুই নতুনভাবে দেখতে শেখে মানুষ। রামমোহনের কলকাতা বাসের (১৮১৫) সূচনা-কাল থেকেই বাংলার জাগরণের শুরু বলে মনে করেন ওদুদ। 'ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচার' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ওদুদ ভট্টাচার্য ও রামমোহনের ধর্মবোধের পার্থক্য নির্দেশ করতে চান। ধর্ম বলতে রামমোহন যে নৈতিক বা আত্মিক উন্নতি বিশেষভাবে বুঝতেন তার পরিচয় রয়েছে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ডঃ ডাফের কাছে তিনি যে উক্তি করেন, তাতেও। "সব রকমের যথার্থ শিক্ষা হওয়া চাই ধর্মানুগত।" তবে রামমোহনের কাছে ধর্মবোধ অন্ধ অর্থ বহন করে। "অকপট সত্যানুশ্রিতা আর জগতের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের যোগই" তাঁর কাছে ধর্মের অর্থ। হাফিজের নিচের ফার্সী বয়েতের মধ্যে ধর্মের যে ভাবটি ফুটে উঠেছে, রামমোহন ও ওদুদের কাছেও ধর্ম সেই অর্থই বহন করে

ধর্ম জীবের সেবা ভিন্ন আর কিছু নয়
জপমালা, আলখেল্লা ও আসনে ধর্ম নেই।

'তুহ্‌ফাতুল মুওহ্‌হিদীন' (একেশ্বর বাদীদের জন্য উপহার) গ্রন্থের ভূমিকা থেকেও দীর্ঘ উদ্ধৃতির উল্লেখ করে ওদুদ ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিষ্কার করতে চান। ওদুদ প্রমাণ করতে চান, ধর্মচিন্তার সঙ্গে যখন পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিবর্তনশীল আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রীতিনীতির মিশেল দেওয়া হয়, তখনই বিপর্যয়ের শুরু। ধর্মমত ও ইহজাগতিকতার দীর্ঘকালের এই বন্ধন ইউরোপের নবজাগরণ ছিন্ন করে। বাঙলায় রামমোহনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই নবজাগরণের শুরু।

কিন্তু সময়ের অগ্রযাত্রার সঙ্গে নানান ঘাত প্রতিঘাতে বাঙলার নবজাগরণের সে ধারা কী ভাবে পরিবর্তিত হয় এবং উনিশশতকের শেষপাদে এসে অসামান্য সৃষ্টি ধর্মের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তা কী ভাবে প্রবল 'হিন্দু-ঐতিহ্য গর্বে' পরিণত হয়, ওদুদ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তার ঐতিহাসিক গতিপথ অঙ্কন করেন। 'সৃষ্টিধর্মী উৎকৃষ্ট চিন্তার স্থানে' 'হিন্দু-ঐতিহ্যগর্ব' স্থান পাওয়াকেই ওদুদ বঙ্কিমের সবচেয়ে 'মারাত্মক' দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেন। কেননা "ঐতিহ্য-গর্ব মানুষকে কিছু সচেতনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতারিত করে, কেননা ঐতিহ্য-গর্ব পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেনা, বরং বাড়িয়ে চলে তার অন্ধ আবেগ।" তাই উগ্রজাতীয়তা "ইউরোপে প্রলয় ঘটিয়েছে, আমাদের দেশেও এরই মধ্যে খণ্ড প্রলয় ঘটিয়েছে।" চতুর্থ বক্তৃতায় উনিশ শতকীয় জাগরণে মুসলমানের সরে থাকার কারণও যোগ্যতার সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন। নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলি ও আমীর হোসেনের প্রচেষ্টায় শতাব্দীর শেষপাদে মুসলমানদের মধ্যে যে ইংরেজি শেখার কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বড় ত্রুটি ওদুদ নির্দেশ করেছেন এই বলে যে ইহজাগতিক স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় তাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় লাভের প্রয়োজন পড়েছিল। কিন্তু "নতুন শিক্ষাকে সত্যই কার্যকরী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির, সে বিষয়ে তারা আদৌ সচেতন হয়নি।" বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ওদুদ সে জীবনবোধের উন্মেষ লক্ষ করেন বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মধ্যে। তবে বিচার-বিশ্লেষণ করে ওদুদের সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে "বাংলার জাগরণ বিপর্যস্ত হয়েছে।" একথা আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন আব্দুল কাদিরের কাছে লেখা চিঠিতে। তবে ক্ষুদ্রতার মৃত্যু ঘটিয়ে ধর্মবর্ণ জাত-পাত নির্বিশেষে বাঙলার ও ভারতের জনগণ আবার নব-জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হবে, সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবে এ আশা তাঁর একান্তই আন্তরিক। 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' গ্রন্থে শরৎ ও পরবর্তী ৩১ জন কথাশিল্পী নিয়ে কথা বলেছেন ওদুদ। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৭ পৃষ্ঠার বক্তৃতাটি Tagore's Role in the Reconstruction of Indian Thought' নামে প্রকাশিত হয়। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১ম ও ২য়খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৬৯ ও ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে। বইটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। ১৩৭৩ এর বৈশাখে 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহকর্মীদের' উদ্দেশে প্রকাশ করেন 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' কলকাতা থেকে। ১৩৭৩ ও ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'পবিত্র কোরআনের' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

ঢাকা বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ওদুদ রচনাবলী ২য় খণ্ডে 'রাজনৈতিক পত্রাবলী' শীর্ষে ওদুদের ৮টি চিঠি ছাপানো হয়েছে যার মধ্যে তাঁর দর্শন ও রাজনীতি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সবগুলি চিঠিতেই সমকালীন সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও, তার মধ্যেও ওদুদের রেনেসাঁস ভেজা মনের প্রকাশ ঘটে। সেদিক থেকে চিঠিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আবুল হুসেনের আদেশের নিগ্রহ সম্পর্কে মৌঃ আকরাম খাঁ 'মোহাম্মদীতে' যে আপত্তিকর ও রুচিহীন মন্তব্য করেন, তারই জবাবে ওদুদ প্রথম চিঠিখানি লেখেন। দ্বিতীয় চিঠিটি আব্দুল কাদিরকে লেখা। কাদির স্বদেশী আন্দোলন ও ওহাবী আন্দোলনকে এক পর্যায়ে ফেলে 'জয়তী'র সম্পাদকের পাঁজিতে যে মন্তব্য করেন তার উত্তরে ওদুদ এ চিঠিতে ঐ দুই আন্দোলনের পার্থক্য নির্দেশ করেন। কাদিরকে লেখা তৃতীয় চিঠিতে মূলত রেনেসাঁসের আলোকেই তিনি হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সমস্যাটি দেখার চেষ্টা করেছেন। মানুষের 'সৃষ্টিক্ষমতার' উপর ওদুদের অগাধ বিশ্বাস। সেই-জন্যে বার বার তিনি মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার উল্লেখ করেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাই ভারতের সংখ্যাগুরু মুসলমান কেবল স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে, ওদুদ তা সমর্থন করতে পারেন না। তাই 'নির্বাচন-প্রসঙ্গে' চিঠিতে তিনি কাদিরকে Inferiority Complx-এর বিপদ সম্পর্কে লেখেন। একমাত্র সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েই যে ছোট দল সমাজে উঁচুস্থান দখল করতে পারে, তা প্রমাণ করেন ইউরোপের সংখ্যালঘু ইহুদী সম্প্রদায়ের উদাহরণ উপস্থিত করে। দুর্বল প্রতিপক্ষ হয়েও 'সৃষ্টিক্ষমতা' তাদের উচ্চস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। "হিন্দুদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েও" ওদুদ মনে করেন যে "হিন্দুরা আলোর পথে, জীবনের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু মুসলমান ?" যারা সামান্য লাভের আশায় ক্ষমতার কাছে চির অবনত শির অথবা গোঁয়ার তারাই তার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা, যারা

জলজ্যান্তভাবে কাণ্ডজ্ঞানহীন, নীতিহীন, এমনকি শাস্ত্রজ্ঞান-হীন, সেই বৃক্ষের দল আজো তার ধর্মজীবনের নেতা আর আর তার সাহিত্যের আসরে রুচিহীন অর্ধশিক্ষিতের দল আজো প্রবল প্রতাপ।" কতবড় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা তিনি ছিলেন, উপমহাদেশের আজকের মুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। 'বুলবুল' পত্রিকায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের কড়া জবাবে ওহুদ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে প্রমাণ করেন যে "ধর্ম মাত্রই মোটের উপর Symbolism—কাজেই কোনো-না কোনো রকম প্রতীক চর্চা—অক্ষকথায় প্রতিমা পূজা।"···প্রতীকচর্চা বা প্রতিমা পূজা অভিশাপগ্রস্ত হয় তখনই যখন এটি হয়ে ওঠে বিশেষ প্রতিমার বা বিশেষ পদ্ধতির অন্ধপূজা।" তাই ওহুদ উক্ত চিঠিতে সিদ্ধান্ত টানেন "হিন্দু-মুসলমান মারামারি করছে ধর্মভাবের অধীন হয়ে নয়, ধর্মভাবকে বিসর্জন দিয়ে, তথাকথিত ধার্মিকতা নিয়ে অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠানের একান্ত পূজারী হয়ে।"

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলমানের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা এই 'অভূতপূর্ব' ব্যাপারটি যখন ঘটে, তখন ঢাকার মুসলিম সমাজ একশ বছর আগে কলকাতার হিন্দু সমাজের মতই রক্ষণশীলতার দুর্গে বাস করছিল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মধ্য দিয়ে যাঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' ঘটাতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ 'বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত' করে মুসলিম সমাজকে রেনেসাঁসের পথে আনতে চেয়েছিলেন তাঁরাও রক্ষণশীল অভিজাত শ্রেণীর হাতে নাজেহাল ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে 'সমাজের' গোড়া পত্তন হয়। সম্মুখে দেখা না গেলেও এই সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন তিন কাজী: কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০); কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮) ও কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)। এঁরা তিনজনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। 'সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবুল হুসেন ও কাজী ওহুদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ধর্মান্ধও রক্ষণশীল, মুসলিম সমাজে রেনেসাঁসের আলো জ্বালানোই ছিল এর প্রথম ও প্রধান কাজ। এই রেনেসাঁসের বাণী তাঁরা আহরণ করেছিলেন হজরত মোহাম্মদ, রামমোহন, কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ, রোঁমা রোলাঁ, শেখ সাদী প্রমুখের কাছ থেকে। এই সমাজের কাজ করতে গিয়ে তাঁরা যে লাঞ্ছনা আর সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়েছিলেন ওহুদের বহু লেখায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। এই লাঞ্ছনা, জীবনের ভয় আর সন্ত্রাসের মধ্যে 'সাহিত্য সমাজ' পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পেরেছিল মাত্র তিন বছর। এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাজী নজরুল ও দশম অধিবেশনে শরৎচন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন। "শেষের দিকে বৃহত্তর দেশে সাম্প্রদায়িক অবনিবনা আর শতকরা পঁয়তাল্লিশ-আদির ধ্বনির প্রভাব এত বেশি হল যে 'সাহিত্য সমাজের' মত অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের প্রতিষ্ঠান অর্থহীন হয়ে পড়ল।"

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—এই মুখবাণী বুকে ধারণ করে 'সাহিত্য সমাজের' বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' পর পর পাঁচ বছর প্রকাশিত হবার পর তার অকালমৃত্যু ঘটে অনিবার্য কারণে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রথম সংখ্যায় বলা হয় "শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন।" রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতি-রোধের সম্মুখীন হয়েও ওহুদ মনে করেন "মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেইদিন বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপর উল্লেখ-যোগ্য প্রভাবই বিস্তার করেছিল—তবে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা, তা জানা যাবে ভবিষ্যতে।" ওহুদের সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কাছে এর উত্তর কী?

(প্রবন্ধটি রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা রূপে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের ১১১ তম জন্মদিন উপলক্ষে স্বরাহ-সম্প্রীতি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঠিত।)

মাটি

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কাদাকণার বৈশিষ্ট্য

বালি, পলি ও কাদা অংশের মধ্যে শেষোক্তই প্রধানত মাটির প্রকৃতি নির্ণয় করে। সুতরাং মাটিকে সম্যকরূপে জানতে হলে কাদাকণার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা দরকার।

আমরা জেনেছি যে মাটির কাদাকণার চেহারা দ্বিমাত্রিক প্লেটের মত। প্রত্যেকটি কণার আয়তনকে যদি সমমাপের গোলকে পরিণত করা যায় তা হলে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ থেকেই কণার আয়তনের মাপ পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির দ্বারা কাদাকণার ব্যাসার্ধের মাপ হচ্ছে 2×10^{-4} থেকে 5×10^{-7} সেমি। জলে প্রলম্বিত অবস্থায় কাদাকে ঘোলাটে দেখা যায় গুচ্ছগুচ্ছ আলোর বিচ্ছুরণের দরুন। কিন্তু প্রতিটি কাদাকণাকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। তার জন্য দরকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পৃষ্ঠতল

ক্ষুদ্র বলেই কাদাকণা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লাভ করে। যেমন, পৃষ্ঠতলের আয়তন। চল্লিশ গ্রাম কাদাকণা (গড় ব্যাসার্ধ 10^{-5} সেমি) প্রায় একটি ফুটবল মাঠকে এককণা গভীর আস্তরণে আবৃত করতে পারে। যে কোন উত্তম চাষ যোগ্য জমির মাত্র 10 বর্গ সেমি ক্ষেত্রের 15 সেমি গভীর একটি মাটির নমুনাতে প্রায় চল্লিশ গ্রাম কাদা পাওয়া যায়। এই হিসাব থেকে পৃষ্ঠতলের বিরাট আয়তন সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা করা যায়।

শোষণ ক্ষমতা

পৃষ্ঠতল নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য শোষণ করার ক্ষমতা রাখে। মাটির বেলায় জল শোষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাদাকণার পৃষ্ঠতলের আয়তন বেশি, অতএব তার জল শোষণের ক্ষমতাও বেশি। শোষণকর্ম সাধারণত বহিঃপৃষ্ঠ-তলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কাদাকণার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতল থাকার দরুন সেখানেও জলশোষণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। কাদাকণাতে যদি 2 : 1 শ্রেণীর মিনারেল, বিশেষ করে স্মেকটাইট, থাকে তাহলে তাদের বেলায় জল শোষণ ও ধারণের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতলের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। দুটি 2 : 1 স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অনায়াসে জল অণু-প্রবেশ করতে পারে। এই সম্পর্কে আগের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। 2 : 1 মিনারেল-এর তুলনায় 1 : 1 মিনারেল-এর, যেমন কেওলিনাইট, কাদাকণার জলশোষণ ক্ষমতা প্রধানত বহিঃপৃষ্ঠতলের উপর সীমাবদ্ধ এবং অন্তঃপৃষ্ঠ-তলের অবদান খুবই কম। যথা, কেওলিনাইটের অন্তঃ ও বহিঃ পৃষ্ঠতলের পরিমাণ প্রতি গ্রাম যথাক্রমে 8 এবং 30 বর্গ-মিটার। সেই তুলনায় স্মেকটাইট অথবা মন্টমরিলনাইটের বেলায় যথাক্রমে 500 এবং 100 বর্গমিটার এবং ইলাইটের ক্ষেত্রে 80 এবং 60 বর্গমিটার। এই কারণে কাদা অংশে স্মেকটাইটের উপস্থিতিতে মাটি জলের সংস্পর্শে ফেঁপে ওঠে। এই ফেঁপে ওঠার বিষয়টিও আলোচনা করা হয়ে ছিল মাটি এবং মিহি শিলাচূর্ণের মধ্যে বিভেদ বোঝাতে গিয়ে।

বৈদ্যুতিক চার্জ

এই বিষয়টিও আলোচিত হয়েছিল কীভাবে 2 : 1 মিনারেলগুলিতে নেগেটিভ চার্জের উদ্ভব হয়। তারই ফলে জল অণু কাদাকণার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণটি এই: সব রকম অণুর মত জল অণুও প্রশম অর্থাৎ পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ সমান। কিন্তু জলের মত আরও অনেক তরল পদার্থ আছে যাদের অণুস্থিত পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের অবস্থিতি একই বিন্দুতে নয়। তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে। এর দরুন সামগ্রিকভাবে অণুটি প্রশম কিন্তু তার এক প্রান্তে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ সামান্য বেশি। অতএব অন্যপ্রান্তে অণুটির নেগেটিভ চার্জ ততটুকুই বেশি। জল এমনি একটি অণু। তার দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সামান্য পজিটিভ এবং অক্সিজেন ততটুকুই নেগেটিভ, যেহেতু অক্সিজেন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেয়। কাদাকণার নেগেটিভ চার্জ জল অণুর পজিটিভ চার্জ প্রাপ্ত হাইড্রোজেনকে আকর্ষণ করে। কাদাকণার চার্জের পরিমাণ যত বেশি হবে তত বেশি জল অণু বিস্তৃত অবস্থায় কাদাকণার প্রতি আকৃষ্ট হবে। যেসব তরল পদার্থের অণুতে জল অণুর মত পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের ব্যবধান আছে, তারাও কাদাকণার দ্বারা অনুরূপ আকৃষ্ট হয়। এরকম তরল পদার্থের মধ্যে মিথাইল ও ইথাইল অ্যালকোহল, এথিলিন গ্লাইকল, গ্লিসারিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরল পদার্থের শোষণ ক্রিয়া কাদাকণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আয়ন বিনিময়

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কাদাকণার নেগেটিভ চার্জ। এই চার্জের উৎপত্তি সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। কাদাকণার নেগেটিভ চার্জকে প্রশমিত করার জন্য যে সব পজিটিভ চার্জযুক্ত ক্যাটায়ন মাটিস্থিত দ্রবণে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+} Mg^{2+}, Fe^{2+}, Al^{3+} Fe^{3+}- উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রত্যেক মাটির কাদাকণায় এর সবকটিই থাকতে পারে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে ক্যাটায়নটি অনুপাতে অধিক সে-ই মাটির প্রকৃতি নির্ধারণ করে। যেমন, H+-এর আধিক্যবশত মাটি অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। কাদাকণায় Na^+-এর আনুপাতিক আধিক্য মাটির ক্ষারত্বের মূল কারণ। সাধারণ চাষযোগ্য মাটিতে K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} অধিক পরিমাণে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই ক্যাটায়নগুলি উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।

কী কী ক্যাটায়ন কত পরিমাণে কাদাকণায় তথা মাটিতে আছে জানতে হলে এমন একটি ক্যাটায়ন দিয়ে মাটিস্থিত ক্যাটায়নগুলিকে বিনিময় করে নিয়ে আসতে হবে, যে ক্যাটায়ন সাধারণত মাটিতে থাকে না। এদের মধ্যে NH_4^+ এবং Ba^{2+}কে পছন্দ করা হয়। কাদাকণার চার্জকে ভিত্তি করে যে আয়ন বিনিময় সংঘটিত হয়, কাদাকণা তথা মাটির এও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই কারণে আয়ন বিনিময় নিয়ে বিশদ আলোচনা দরকার।

একাধিক ক্যাটায়ন দ্বারা প্রশমিত কাদাকণাকে যদি M-কাদা লেখা হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে M-ক্যাটায়নদের চার্জের যোগফল কাদাকণায় অবস্থিত নেগেটিভ চার্জের সমান। এই M-কাদার সঙ্গে যদি NH_4OAC (অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট)-এর বিক্রিয়া করা হয় তা হলে নিম্নলিখিত আয়নবিনিময় ঘটে :

$M\text{-কাদা} + NH_4(OAC) \rightleftarrows NH_4\text{-কাদা} + M\text{-}(OAC)$

উপরের সমীকরণটিতে M-কে একযোজী ক্যাটায়ন বলে ধরা হয়েছে। অন্যযোজী ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে চার্জসাম্য বজায় রেখে সমীকরণটি লিখতে হবে। উভমুখী চিহ্নটির তাৎপর্য এই যে M-কাদার প্রশমনে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট প্রয়োগ করলে M+আয়ন বেরিয়ে এসে অ্যাসিটেট আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং NH_4^+ কাদার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বিক্রিয়াটি আয়ন বিনিময়ের একটি দৃষ্টান্ত। এই ধরনের বিক্রিয়ায় চার্জসাম্য বজায় রাখাই একমাত্র শর্ত। M যদি দ্বিযোজী ক্যাটায়ন হয় তা হলে সমীকরণটি হবে : M^{2+}-কাদা + $2NH_4^+ \rightleftarrows (NH_4^+)_2$-কাদা + M^{2+}। তেমনি বেরিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ ব্যবহার করলে সমীকরণ হবে :

$2M^{2+}\text{-কাদা} + Ba^{2+} \rightleftarrows Ba\text{-(কাদা)}_2 + 2M^+$

অথবা,

$M^{2+}\text{-কাদা} + Ba^{2+} \rightleftarrows Ba\text{-কাদা} + M^{2+}$

ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা

কাদাকণার আয়তন এমন যে অতিমিহি ছিদ্রযুক্ত ফিলটার কাগজ তাদের ধরে রাখতে পারে। অতএব একটি মাটির নমুনা ফানেলে বসানো ফিলটার কাগজে রেখে তার উপর অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ ঢেলে দিলে কাদাকণার সঙ্গে যুক্ত M-ক্যাটায়নগুলি NH_4^+-এর সঙ্গে বিনিময় করে করে ফিলটার কাগজ ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং একটি পাত্রে ধরা পড়ে। যেহেতু বিক্রিয়াটি উভমুখী তাই একবারে M-ক্যাটায়নগুলি বেরিয়ে আসেনা। কয়েকবার এই বিক্রিয়াটি চললে বিনিময় সম্পূর্ণ হয়। সাধারণত 10—20 গ্রাম মাটিকে এক লিটার এক নর্মাল অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণের দ্বারা বার বার বিক্রিয়া করলে নিঃসন্দেহে বিনিময় সম্পূর্ণ হয়। এই পদ্ধতিতে ফিল্টার কাগজের উপর পড়ে থাকছে NH_4-কাদা এবং তৎসহ লেগে থাকা কিছুটা অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ। বেরিয়ে আসা এক লিটার দ্রবণে থাকে M-ক্যাটায়নগুলি ; H+ সমেত। H+ থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড রূপে।

NH_4-কাদার সঙ্গে লেগে থাকা অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেটকে 50% অ্যালকোহল জলের মিশ্র দ্রবণের দ্বারা ধুয়ে সরিয়ে দিয়ে কেবল কাদা অংশে কতটা NH_4^+ যুক্ত আছে জানা দরকার। এর জন্য NH_4-কাদা অংশের মধ্যে ক্ষার দ্রবণ প্রয়োগ করে তাপমাত্রা বাড়ালে অ্যামোনিয়া গ্যাস হিসাবে বেরিয়ে আসে। নির্গত অ্যামোনিয়াকে জানা ঘনত্ব-বিশিষ্ট সালফ্যারিক অ্যাসিড দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করা হয়। সব অ্যামোনিয়া বেরিয়ে আসার পর অপ্রশমিত সালফ্যারিক অ্যাসিডের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। তা থেকে সহজেই হিসাব করে বলা যায় প্রতি 100 গ্রাম মাটিতে কী পরিমাণ অ্যামোনিয়া আছে। এই অ্যামোনিয়ার পরিমাণ লেখা হয় মিলিইক্যাইভেলেণ্ট (মি. ই.)-এর এককে। এক নর্মাল দ্রবণের এক ঘন সে. মি. হল এক মি. ই.-এর সমান। মাটিতে যে কয়টি মিনারেল অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে মন্টমরিলনাইট, ইলাইট ও কেওলিনাইট উল্লেখযোগ্য। এদের প্রতি 100 গ্রাম নমুনার গড় ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা

যথাক্রমে 80, 40 এবং 6 মি.ই.। এই প্রসঙ্গে এই তিন-শ্রেণীর মিনারেল-এর অন্তঃ এবং বহিঃ পৃষ্ঠতলের (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলনা করা যেতে পারে। দেখা যায় যে, মিনারেল-এর পৃষ্ঠতল যত বেশি তার ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা ততোধিক।

ফিলটার কাগজ ভেদ করে যে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ বেরিয়ে আসে তাতে আছে সেই সব ক্যাটায়ন যারা অ্যামোনিয়ামের সঙ্গে বিনিময় করেছে। অতএব এই দ্রবণটি বিশ্লেষণ করে ঐ ক্যাটায়নগুলি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বলা দরকার যে মাটিতে বহুরকম ক্যাটায়ন থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} পরিমাণে অন্যান্যদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। এই কারণে সাধারণত এই কয়টি ক্যাটায়নের পরিমাণই নির্ণয় করা হয়। অন্যান্যদের পরিমাণ অতি সামান্য থাকার দরুন বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

মাটির অম্লত্ব নির্ণয়

অম্লমাটিতে H^+ বিদ্যমান। তার পরিমাণ নির্ণয় করার অনেকগুলি পদ্ধতি জানা আছে, তার মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত তা হল কোন জানা ঘনত্বের ক্ষার দ্রবণ সাহায্যে প্রশমন করা। অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে বিনিময়লব্ধ অ্যাসেটিক অ্যাসিড সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। এই অ্যাসিডের পরিমাণ মেপে বিনিময়যোগ্য H^+-এর পরিমাণ জানা যায়। অন্য পদ্ধতিটি খুবই সহজ। 14 থেকে pH-এর মূল্য বাদ দিলে পাওয়া যায় pOH। যেমন, যে মাটির pH = 9, তার pOH = 14-9 = 5। অতএব পূর্বে উল্লিখিত সমীকরণ অনুসারে OH^--এর এবং H^+-এর ঘনত্ব যথাক্রমে 10^{-5} 10^{-9} মোল/লিটার। নমুনা হিসাবে নিম্নে তিনটি মাটির ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি দেওয়া হল :

মাটির প্রাপ্তি স্থান	pH	কাদা অংশ (%)	মুখ্য মিনারেল	ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা (মি. ই./100 গ্রাম)	বিনিময় লব্ধ Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	H^+
চিতোর গড় (রাজস্থান)	7.3	17.3	মন্টমরিলনাইট	39.6	33.2	5.0	0.4	0.2	0.0
দিল্লী	10.2	18.7	ইলাইট	11.6	1.0	1.1	0.6	8.9	0.0
ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা)	4.7	16.6	কেওলিনাইট	3.2	1.0	0.4	0.1	0.0	1.7

এই তিনটির মধ্যে ভুবনেশ্বর ও দিল্লীর মাটি যথাক্রমে অম্ল ও ক্ষারীয়। এই তথ্য সমর্থিত হচ্ছে pH ও H^+-এর এবং Na^+-এর বিনিময় মূল্য থেকে। চিতোর গড়ের নমুনাটি প্রায় প্রশম। তারই সমর্থনে দেখি যে বিনিময় লব্ধ H^+-এর মূল্য শূন্য। প্রায় একই পরিমাণ কাদা অংশ থাকা সত্ত্বেও মাটির ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা সর্বাধিক চিতোর গড়ের মাটির, তারপর দিল্লীর এবং সর্বশেষ ভুবনেশ্বরের মাটির। দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটি মাটির মিনারেল হল যথাক্রমে মন্টমরিলনাইট, ইলাইট ও কেওলিনাইট। এদের কাদাকণার পৃষ্ঠতলের আয়তনও একই ক্রম অনুসরণ করছে।

এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা, তরল পদার্থের শোষণ বৈদ্যুতিক চার্জ ইত্যাদির মূলে রয়েছে কাদাকণার পৃষ্ঠতলের পরিমাণ। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কাদাকণা ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয়।

কাদাকণার প্রলম্বন বা কলয়ড

একশো ঘন সে.মি. জলে এক গ্রাম মত কাদাকণা মিশিয়ে দিয়ে একটি সুস্থিত প্রলম্বন তৈরি করা যায়। কাদাকণা যত মিহি হবে, সুস্থিতি তত বেশি। সুস্থিতির প্রকৃত কারণ হল পৃষ্ঠতলের জলশোষণ ক্রিয়া এবং কণার বৈদ্যুতিক চার্জ। এই প্রকার সুস্থিত প্রলম্বনকে বলা হয় কলয়ড। এই অবস্থায় প্রতিটি কণা পৃথকভাবে বিচরণ করে। অতি অল্প ঘনত্ব বিশিষ্ট প্রলম্বনের একটি ফোঁটা যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নজর করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে কণাগুলি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল অণু সামান্য তাপমাত্রার বিভেদের কারণে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। কিন্তু চলমান জল অণুর সঙ্গে কাদাকণার থাকা লাগলে কাদাকণাকে চলতে ও ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই চলমানতাকে বলা হয় ব্রাউনীয় বিচলন। সব রকম কলয়ডের

এটি একটি বৈশিষ্ট্য। ব্রাউনীয় বিচলনের ফলে কাদা কণা তথা যে কোন কলয়ড কণা থিতিয়ে পড়ে না। তা ছাড়া নেগেটিভ চার্জ প্রাপ্ত কাদা কণাদের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ থাকার দরুন তারা কাছাকাছি আসতে পারে না। এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে। এই দূরত্ব কমাতে পারলে একাধিক কণা একত্রিত হয়ে একটি দানার আকার ধারণ করতে পারে। সেই অবস্থায় ব্রাউনীয় বিচলন বড় আয়তনের কণা সমষ্টিকে ভাসিয়ে রাখতে পারে না। অধিকন্তু মাধ্যাকর্ষণের ফলে তারা থিতিয়ে পড়ে। কলয়ড অবশেষে সুস্থিতি হারিয়ে ফেলে।

কণাদের মধ্যস্থ দূরত্ব কমানো যায় উপযুক্ত পরিমাণ লবণের দ্রবণ ব্যবহার করে। যেহেতু কাদাকণার চার্জ নেগেটিভ, লবণের ক্যাটায়ন-ই দূরত্ব কমতে সাহায্য করে। ক্যাটায়নের কার্যকারিতা তার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। একটি পরীক্ষার দ্বারা এই নির্ভরশীলতা দেখানো যায়। দশ-মিলি মাপের একটি কলয়ড প্রলয়নকে তিনটি পরীক্ষানলে রাখা হল। প্রথমটিতে এক মিলি 0.1NKCL ঢেলে দেওয়া হল। দেখা যাবে যে কিছুক্ষণের মধ্যে কণাগুলি দানা বেঁধে থিতিয়ে পড়েছে। এবং দ্বিতীয়টিতে যদি মাত্র এক মিলি 0.001N $CaCl_2$ দেওয়া হয় তা হলে প্রায় একই সময়ে কলয়ড কণা থিতিয়ে পড়বে। আর তৃতীয়টিতে এক মিলি 0.0001N $AlCl^3$ দিতেই একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ Kcl থেকে $CaCl_2$ প্রায় একশ' গুণ এবং $AlCl_3$ প্রায় হাজার গুণ কার্যকর। কটকিরি দ্বারা ঘোলাজল পরিশ্রুত করার কার্যকারিতা সর্বাধিক তার কারণ কটকিরিতে Al^{3+} রয়েছে।

কাদাকণার কলয়ড প্রলয়নের তুলনায় হিউমাস কলয়ড অধিকতর সুস্থিত, কারণ হিউমাস কণা কাদাকণা থেকে অনেক ছোট এবং তার বৈদ্যুতিক চার্জ ও পৃষ্ঠতলের আয়তন কয়েকগুণ বেশি। এই কারণে হিউমাসের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতাও খুব বেশি। হিউমাসের বিভিন্ন অংশের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা 300-900 মি. ই. / 100 গ্রাম পর্যন্ত মাপা হয়েছে।

অম্লত্বের ও ক্ষারত্বের প্রতিকার

মাটির অম্লত্বের জন্য দায়ী কাদাকণায় অবস্থিত বিনিময় যোগ্য H^+। H^+-এর আধিক্য জানিয়ে দেয় যে মাটিতে উদ্ভিদের উপযোগী পুষ্টিদ্রব্য যথা Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+ ইত্যাদির অভাব ঘটেছে। এছাড়া অম্ল মাটিতে Al^{3+}-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। Al^{3+} বহু শস্যাদির পক্ষে, বিশেষ করে পাটশস্যের ক্ষেত্রে, বিষবৎ। একমাত্র চা-চাষের পক্ষে অম্ল মাটি কিংবা Al^{3+} হানিকর নয়, বরং অত্যাবশ্যক। অতএব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অম্লত্বের প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য অম্ল মাটিতে চুণ প্রয়োগ বিধেয়। চুণ জলের সান্নিধ্যে ক্ষার প্রকৃতি লাভ করে। তাছাড়া চুণে আছে Ca^{2+}। যার ফলে চুণ ব্যবহারে বিনিময় বিক্রিয়ার দ্বারা H^+ কাদাকণা থেকে বেরিয়ে যায়, তার স্থান অধিকার করে Ca^{2+}। বেরিয়ে আসা H^+ চুণের OH^--এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং কাদাকণা প্রশমিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কী পরিমাণ চুণ ব্যবহার করতে হবে তা নির্ভর করে H^+-এর পরিমাণের উপর অথবা pH-এর উপর। সাধারণতঃ H^+-কে প্রশমনের জন্য যে পরিমাণ চুণ দরকার তার থেকে কিছু বেশি ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

মাটির ক্ষারত্ব প্রতিকারের বিধিও অনুরূপ। হয় অম্ল তৈরি করে এমন বস্তু প্রয়োগ করতে হয়, যেমন গন্ধক। গন্ধক মাটিতে জারিত হয়ে সালফ্যুরিক অ্যাসিড তৈরি করে। তার ফলে ক্ষারত্ব বিনষ্ট হয়। অন্যথা কাদাকণা স্থিত Na^+ কে Ca^{2+} দ্বারা বিনিময় করা। জিপসাম ($CaSo_4$) ব্যবহার করে এই ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে Na-কাদা $CaSo_4$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে Na_2So_4 তৈরি করে। সুতরাং জিপসাম ব্যবহার করে লবণহীন সেচের জল দিয়ে Na_2So_4-কে শিকড়ের নাগালের বাইরে সরিয়ে দেওয়া দরকার। নইলে মাটি ক্রমশ লবণাক্ত হতে পারে।

আয়ন বিনিময়ের গতি প্রকৃতি

আয়ন বিনিময় একটি উভমুখী বিক্রিয়া, যেমন

$$H\text{-কাদা} + K^+ \rightleftarrows K\text{-কাদা} + H^+.$$

মাস অ্যাকসন নিয়ম অনুসারে K^+-এর পরিমাণ বাড়াতে থাকলে H^+ বিনিময়ও বাড়ে। এই বৃদ্ধি রৈখিক নিয়মে ঘটে না। অর্থাৎ K^+-র পরিমাণ দ্বিগুণ করলে H^+-এর পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়ে না। বরঞ্চ প্রথম কিস্তিতে যতটা বিনিময় হয় দ্বিতীয় সমান কিস্তিতে তার চেয়ে কম বিনিময় হয়, তৃতীয় সমান কিস্তিতে আরও কম। শেষ পর্যন্ত বিনিময় প্রায় শূন্য, কারণ বিনিময় যোগ্য H^+ কাদাকণাতে আর নেই। যোজাতার প্রভাব এখানেও দেখা যায়। যেমন K^+-র পরিবর্তে Ca^{2+} প্রয়োগ করলে H^+ বিনিময় অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়, Al^{3+} ব্যবহারে বিনিময় বৃদ্ধি পায় তারও বেশি।

(আগামী সংখ্যায়)

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইতিবৃত্ত

নিশীথরঞ্জন রায়

গত বছর ও ডিসেম্বর অযোধ্যায় যে কাণ্ড ঘটে গেল সেটি শুধু আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সব চাইতে কলঙ্কজনক ঘটনা বলেই চিহ্নিত হয় নি, দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতি জোরদার করার সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রবল অন্তরায় হিসেবেও। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বুদ্ধিজীবীরা নিয়মিত ভাষণ দিচ্ছেন, পদযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহাপুরুষদের বাণী। কৃষক শ্রমিক ব্যবসায়ী, শিল্পী সাহিত্যিক মহিলা ছাত্রছাত্রী—বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী এগিয়ে আসছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে।

নিরপেক্ষ এবং বাস্তবধর্মী বিচারে এ কথাটিই মনে হয় যে এ বিষয়ে আরও করণীয় রয়েছে। করণীয় কর্মসূচীর একটি নূতন দিক সম্প্রতি উন্মোচিত করেছেন 'দাঙ্গার ইতিহাস' বইটির লেখক শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সুধ্যাত প্রবন্ধকার, সাহিত্যসেবী, সমাজসেবী। এ ছাড়া তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য গান্ধীবাদে তাঁর অবিচল বিশ্বাস। এই দুটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনায়—'দাঙ্গার ইতিহাস' শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে। এতে সবিস্তারে বিধৃত রয়েছে আঠার শতকের গোড়া থেকে বিশ শতাব্দীর শেষার্ধেই পর্যন্ত দাঙ্গা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ও বিশ্লেষণ। ১৭৯৩ (?) থেকে শুরু করে অযোধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার কাহিনী, তার কারণ বিশ্লেষণ। হতাহতের সংখ্যা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। প্রতিটি দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি তাদের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ফলাফল। বিভিন্ন সময়ের এই সব দাঙ্গার ঘটনাস্থল ছিল আহমেদাবাদ, কাশ্মীর, দিল্লী, গুজরাত, বোম্বাই, অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, বরিশাল, পাবনা, নদীয়া, সর্বোপরি নোয়াখালি, কলকাতা (The Great Calentta Killing), হায়দ্রাবাদ, লখনৌ, আলোয়ার, এলাহাবাদ, গয়া, কানপুর, পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চল, জামসেদপুর, ভাগলপুর, গয়া, উদয়পুর, মোরাদাবাদ, মীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হলেও স্পষ্টতঃই বোঝা যায় কত ব্যাপক এবং ক্ষতিকর হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ।

শুধু হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিয়েই রচিত হয়নি দাঙ্গার সুদীর্ঘ ইতিহাস। সিয়া-সুন্নী, শিখ-হিন্দু, হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-খ্রিস্টান, শিখ-মুসলিম, দলিতশ্রেণী বনাম বর্ণহিন্দু, অসমীয়া-বাংলাভাষী, শিক্ষা ও চাকুরির সংরক্ষণ, ভাষা ইত্যাদি নিয়েও ঘটে গিয়েছে বহু দাঙ্গা। কারণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদের প্রকৃতির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু অমিলও। অযোধ্যাকাণ্ডের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি সাম্প্রতিক কালে যে সব দাঙ্গা ঘটে গেল এবং যার জের এখনও মেটেনি তাতে একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, কিংবা ভাষাগত প্রশ্নে, প্রাদেশিক কিংবা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবিতেও দাঙ্গা ঘটতে দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন দাঙ্গার প্রকৃতিগত প্রভেদ এই সব সাম্প্রতিক দাঙ্গায় প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যাই হোক, দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি একই। সাম্প্রতিক কালের দাঙ্গায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছে। বিস্ময়ের কথা, বিশ শতকের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও ধর্মের নামে রক্তপাত, লুণ্ঠন, হত্যা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত নই আমরা। স্বাধীনতোত্তর কালে আমাদের দায়-দায়িত্ব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবীজ বপন করা হয়েছিল বিদেশী শাসকদের মদতে তা যখন বিষবৃক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছিল সে যুগটি আমরা পেরিয়ে এসেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে এবং পরেও বহু রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে—তবু—স্বাধীন ভারতে সংবিধানের দায়বদ্ধতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমরা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের আওয়াজ তুলছি সগর্বে। এমনি দাবি শুধু সংবিধান বিরোধীই নয়, আমাদের ইতিহাসের শিক্ষারও বিরোধী। এই ইতিহাসের শিক্ষাকে ভিত করেই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিলাম—'নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধান'—আমাদের চিরকালীন আদর্শ। ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে আশেপাশে বলেই হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করতে হবে—এমনি দাবি আমাদের ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বলতার পথেই এগিয়ে নিয়ে যাবে—এ সম্ভাবনাটি অনিবার্য হলেও আমরা আমল দিতে প্রস্তুত নই। পরিকল্পিত হিন্দু রাষ্ট্র যদি অহিন্দুবর্জিত রাষ্ট্রের সমর্থক হয় তাহলে ভারতের বসবাসকারী

মুসলমানদের নিয়ে যে সমস্যা দেখা দেবে, তার অনুরূপ সমস্যা দেখা যাবে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান বাসী অমুসলমানদের নিয়ে। তখনই প্রাসঙ্গিক হবে ধর্মের ভিত্তিতে লোক-বিনিময়। কিন্তু তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর—বাংলাদেশ থেকে ইতিপূর্বে আগত দু'কোটি হিন্দু নিয়ে সমস্যার পূর্ণ সমাধান এখনও হয়নি। লোক বিনিময় সমস্যার সমাধান দূরের কথা নতুন আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে। দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত যদি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় তাহলে তাতে সৃষ্টি হবে আন্তর্জাতিক জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা। এর ফলে যতটুকু আমরা ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছি তার অনেক গুণ বেশি পিছিয়ে যাব—এ কথা সুনিশ্চিত। সুতরাং লোক-বিনিময় এবং যুদ্ধ—এ দু'টির বিকল্পের কথা ভাবতে হবে আমাদের। এর একমাত্র বিকল্প সহাবস্থানের নীতি—বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তির অনুশীলন। হিন্দুরা হিন্দুত্ব জাহির করার চেষ্টা থেকে বিরত হোক, মুসলমানরা শরিয়তের দোহাই দেবার প্রবণতা বর্জন করুক, দুটি গোষ্ঠীই শান্তি ও মৈত্রী রক্ষার অপরিহার্যতা অনুধাবন করুক—তাহলেই রক্তক্ষয়কারী সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করব—বইটির শেষাংশে এই প্রয়োজনের কথাই তুলে ধরেছেন গান্ধীনীতি ভক্ত গ্রন্থকার শৈলেশ কুমার।

মনে পড়ে কলকাতায় ১৯৪৭ সালে অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা গান্ধীজির একক প্রভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে থেমে গেলেও সেই মাসেরই শেষাশেষি যখন সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব আবার মাথা চাড়া দেয়, তখন নিরুপায় গান্ধীজি অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। রাজা গোপালাচারী তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তিনি গান্ধীজিকে অনশন থেকে নিবৃত্ত করার বহু চেষ্টা করেছিলেন। অনশনের বিরুদ্ধে তাঁর অনেকগুলি যুক্তির বিরুদ্ধে একটি যুক্তি ছিল এই রকম—এই সব অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে গুণ্ডার দল—আপনার অনশন তাদের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন ঘটাবে কি? উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন আমার আবেদন গুণ্ডাদের কাছে নয়, মানুষের কাছে, যারা সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগায় তাদের কাছে, বৃহত্তর জনগণের বিবেকের কাছে। আমরা অর্থাৎ শিক্ষিত জনেরা যদি মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক হতে পারি তবেই দাঙ্গার মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে—নচেৎ নয়। গান্ধীজির আবেদন সেদিন যাদের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, শৈলেশবাবুর আশা ভরসাও সেই শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর। তাঁরা যদি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন, শান্তি ও সহাবস্থানের দাবির প্রতি যদি তাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলেই দাঙ্গা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব। শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন শুধু হৃদয়াবেগের কাছে নয়, ইতিহাসের ইঙ্গিতের কাছেও। তাঁর বইটি আমাদের কাছে শুধু ভাবসর্বস্ব আবেদন নয়, যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর ইতিহাস-চর্চা ও বিশ্লেষণ ধর্মবর্ণশ্রেণী নির্বিশেষে সকলের মনে জাগ্রত করবে শুভ বুদ্ধি—এমনটি অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। গ্রন্থকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দাঙ্গার ইতিহাস—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ৭৩ / ১০০ টাকা।

সীতার বনবাস বা সত্যের বনবাস

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বাবরি মসজিদ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেছে ভারতের 'সত্যমেব জয়তে'র আদর্শ। আর সংবিধানের ৪৯নং ধারা—যেখানে বলা হয়েছে It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, [declared by or under law made by Parliament] to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be—ভাঙা ত হয়েইছে। মিথ্যার বিষ ভরে যে তীরে জ্যা রোপণ করা হয়েছিল ১৯৪৯র ২২ ডিসেম্বর তা অবশেষে জ্যা-মুক্ত হল ১৯৯২র ৬ ডিসেম্বর। বিষাক্ত 'শরবিদ্ধ স্বদেশ'। ভারতের বুকে বসেছে মিথ্যার বড়বাজার। ইতিহাসে আসে এরকম এক-একটা অধ্যায়। দুর্যোগের অন্ধকারে তবু হয়ত থাকে কোথাও একটু আশার আলো। ভারতে সেই আশার আলো জালিয়ে রেখেছে জাতীয় সংবাদপত্রগুলি। পশ্চিম বাংলায় 'আনন্দবাজার',

'আজকাল', 'গণশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি একাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ৬ ডিসেম্বরের পরের একমাসে এইসব পত্রিকায় দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের যেসব লেখা প্রকাশিত হয় সেসবের থেকে সাদিকুজ্জামান ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছেন 'শরবিদ্ধ স্বদেশ'। দৈনিক পত্রিকার লেখা সহজে হারিয়ে যায়। লেজারে ছাপা ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু তথ্য ও তত্ত্ব একত্রে সংরক্ষিত থাকল।

গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত, অশোক মিত্র প্রমুখের রচনাগুলিতে আছে দুর্দিনের স্বরূপ বিশ্লেষণ; এগুলির পাশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিপ্রা সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখাগুলিতে আছে সচেতন ও সংবেদনশীল মনের ব্যথা-বেদনা; এবং গৌতম রায়, ইরফান হাবিব, সীতারাম ইয়েচুরি, নাজেস আফরোজ, রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র প্রমুখের রচনাগুলিতে আছে বিপুল তথ্যের সমাবেশ। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্যে দাবি করেছেন এবং এসূত্রে সংবিধানের ৪৪ নং ধারা—The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India—মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অবশ্য এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেননি। ৪৪নং ধারা মেনে চললে 'হিন্দু অবিভক্ত যৌথ পরিবারের আইন'টি বাতিল হবে। এই আইন হিন্দু সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক প্রভুত্বের প্রতীক এবং অনুমান করি, সঙ্ঘ পরিবারের অর্থশক্তির উৎস। তিনি এটাও লেখেননি যে খ্রিস্টান, পার্সি প্রভৃতিদেরও পৃথক পৃথক আইন আছে এবং পৃথক আইনের দোষ শুধু মুসলিমদের। 'আমরা সাংবাদিকরাও দায়ী' প্রবন্ধে এন. রাম ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলির অশুভ ভূমিকা সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র প্রচুর তথ্য দিয়েছেন—'বিশ্বাস' অনুসারে কবে রামের জন্ম, কবে কৃষ্ণের জন্ম এইসব তথ্য-হিসাব থেকে শুরু করে ১৯৭১-৮৯ পর্ব পর্যন্ত সরকার ভাঙাগড়ার খেলায় সঙ্ঘ পরিবারের ভূমিকা সংক্রান্ত বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে তাঁর প্রবন্ধ পরিপূর্ণ। কান্তি বিশ্বাসের প্রবন্ধ থেকে জানা গেল যে ১৯৩৫ সালে লাহোরের একটি ধর্মস্থান নিয়ে বিতর্ক উঠলে শিখ ও মুসলমানরা আদালতের রায় মেনে নিতে রাজি হয় এবং মেনে নেয়ও। আদালতের উপরে কেউ বিশ্বাসের কথা তোলেন নি। শুধু হিন্দুত্ববাদীরাই নিজেদের সুবিধে মত আদালত-সংবিধান ভাঙে বা মানে। দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল থাকতে চান তাঁরা 'শরবিদ্ধ স্বদেশ' সংগ্রহ করে রাখবেন।

দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সোমেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'ঈশ্বরচন্দ্রের রামচন্দ্র দর্শন'। বইটির দুটি ভাগ—দ্বিতীয় ভাগে আছে ১৯১৮ [১৯১৭] সংবতের পাঠ অনুসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' এবং প্রথম ভাগে আছে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ধরে 'সীতার বনবাসে'র সোমেশবাবু কৃত বিশ্লেষণ। তিনি দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকের জাগরণ হল প্রচলিত আচার, প্রথা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ন্যায়-ও-যুক্তির আর মানবিকতার জয়-যাত্রার যুগ। যাত্রার শুরু রামমোহন থেকে এবং তাঁর পরে নারীর জন্যে ন্যায়বিচার দাবির আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন বিদ্যাসাগর। সেটা ছিল সামনে এগিয়ে চলার যুগ।

নবজাগরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেমন মধুসূদন লেখেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'কৃষ্ণচরিত্র', তেমনই বিদ্যাসাগর লেখেন 'সীতার বনবাস' উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সীতার বনবাসে'র ভাষা ও কাব্য নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু এর মৌলিকতা কোথায় এবং ভারতীয় নবজাগরণের কোন্ তাৎপর্যে 'সীতার বনবাস' সমৃদ্ধ তার মূল্য নির্ণয় সোমেশবাবুর আগে কেউ করেছেন কিনা জানিনা। বিদ্যাসাগরের রাম প্রজানুরঞ্জক অর্থাৎ প্রজাতোষণকারী, সিংহাসনানুরক্ত, চলচ্চিত্ত অর্থাৎ অস্থিরচিত্ত এবং তপোবন দেখাবার ছল করে সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন বলে প্রবঞ্চকও; লক্ষ্মণ প্রতিবাদী চরিত্র—ভাই হিসেবে ও দেওর হিসেবে অনন্য; ঋষিকবি বাল্মীকির চরিত্র প্রকাশিত তাঁর সেই উক্তিতে যা শ্রবণ করে 'সীতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন'। লক্ষণীয় যে বিদ্যাসাগারের সীতা মাটিতে পড়ে মারা গেছেন। সোমেশবাবুর মন্তব্য: 'মাতা বসুমতী দ্বিধা বিভক্ত হবার আজগুবি কল্পনা থেকে সরিয়ে এনে বিদ্যাসাগর কঠোর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন'। বিদ্যাসাগরের সীতা মূর্তিমতী সত্য এবং সীতার বনবাস মানে সত্যের বনবাস। নবজাগরণের এবং বিদ্যাসাগরের মানসিকতা বোঝবার জন্যে 'সীতার বনবাস' যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের করে সোমেশবাবু সত্যমিথ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

শরবিদ্ধ স্বদেশ—সাদিকুজ্জামান ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত/ভাষা ও সাহিত্য, ১০-২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-৯/২০ টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্রের রামচন্দ্র দর্শন—সোমেশ দাশগুপ্ত/ভাবনাচিন্তা, ডি-৩ বিদ্যাসাগর নিকেতন কলকাতা ৬৪/২০ টাকা।

প্রসঙ্গ হিন্দু-মুসলমান

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

'ধর্ম' শব্দের অর্থ যদি 'নিয়ম' বা 'আইন' হয় তবে প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের আঙিনায় তা মোটেই ত্রাতা নয়, বরং বিজ্ঞানের দাঁড়া হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ধর্ম যখন 'রিলিজিয়ন', ঐশী মতাদর্শের বাহক, তখন তা সমাজ-বিজ্ঞানের নিরিখে কী ভাবে ব্যাখ্যাত হবে, সে সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। মানুষের ঐশী ধর্মের দুর্বলতাকে চিরকালই এক শ্রেণীর মানুষ কাজে লাগিয়ে কায়দা লুঠতে চায়; আপত্তি সেখানেই, সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন তখনই। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মেশামেশি, সাম্প্রদায়িক প্রশ্রয়, সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। সাম্প্রদায়িক সংঘাত মানুষে-মানুষে আনে বিচ্ছিন্নতা, আর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে ব্রিটিশ সরকার শাসন-তান্ত্রিক সুবিধা লাভের কিকিরে সচেতনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপন করল। আশ্চর্য, এক শ্রেণীর অসৎ মানুষ সেই বিষময় ফলকে নিজেদের স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্য এখনও ব্যবহার করে চলেছে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত নড়বড়ে হয়ে হয়ে যায়। সম্প্রীতির ছবিই দেখা যায় সেখানে।

পঞ্চানন সাহার সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা'য় দুটি সম্প্রদায়ের অবস্থান, সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত নানা সমস্যা আলোচিত। বইটিতে সাতটি বিশ্লেষণাত্মক পরিচ্ছেদ রয়েছে—১. বাংলাদেশে মুসলমান, ২. বাংলার মুসলমানের বৈশিষ্ট্য, ৩. হিন্দু মুসলমান সংঘাত ও সমন্বয়, ৪. ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু মুসলমান, ৫. হিন্দু-মুসলমান পুনরুজ্জীবনবাদ, ৬. বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ৭. দেশ-ভাগ কি অনিবার্য ছিল? এ যাবৎ বহু লেখক এই একই বিষয় তাঁদের রচনায় বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আমাদের আগ্রহ শিরোনামের 'নতুন ভাবনা' শব্দ দুটি নিয়ে। কী হদিশ মিলল সেখানে?

পঞ্চাননবাবু ভূমিকাতে লিখেছেন, 'এই দুই ধর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল একদেশে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুফি ও ভক্তি আন্দোলন এ সমন্বয়েরই নিদর্শন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানে সংঘাত ও সমন্বয় দুই বাস্তব ঘটনা।' (পৃ. 4)। অবশ্য পরক্ষণেই তিনি লিখছেন, 'বাংলাদেশে শহিন্দু মুসলমানে সংঘাতের চেয়ে সমন্বয়ের দিকটাই ছিল প্রধান।' (পৃ. ঐ)। কিন্তু হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সঙ্গে শরিফ মুসলমানদের অর্থাৎ আতরাফ ও আশরাফদের মধ্যে কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও স্পষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। বিরোধ দেখা গেছে শ্রেণী বিন্যাসকে কেন্দ্র করে। সেখানে ধর্ম নয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থানই বড় কথা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের যে চিত্র আমরা দেখি যা বিশেষ বিশেষ স্তরের বা থাক্-এর আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেই। এবং তাদের মধ্যে একই ধরনের সংস্কৃতিও সাধারণত বিকশিত হয়েছে। এই বিষয়টির বিশ্লেষণ পঞ্চানন বাবুর লেখায় আশা করেছিলাম। তা ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার পশ্চাৎপটের গভীরতা পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি লিখেছেন, 'পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্ততপক্ষে হিন্দুদের একাংশের মধ্যে উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে মুসলমনেদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃত হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা তাদের বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি।' (পৃ. 5)। আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূল সূত্রটি বাঁধা আছে অর্থনৈতিক খুঁটিতে। বাংলার বেশিরভাগ মুসলমান কৃষি-শ্রমিক এবং দারিদ্রাসীমার নিচে জীবন রাখতে জীবনান্ত অবস্থা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোন শিক্ষাই তাদের কাছে কোনও উপহার আনে নি। সম অবস্থার হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি। উচ্চ বা মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সঙ্গে নিম্নবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর সমান্তপাতিক হারের হিসেব একেবারেই অচল। কিন্তু হিন্দু-

মুসলমান সম-শ্রেণী সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি অদ্ভুত মন্তব্য করেন, "শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে হীনমন্যতাবোধের শিকার হল। এই হীনমন্যতাবোধ থেকেই সৃষ্টি হল বিচ্ছিন্নতাবোধ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিচ্ছিন্নতার পথ গ্রহণ করল। ব্রিটিশ বিভেদনীতি তাকে আরও উস্কে দিল।" (পৃ. 7)। কিন্তু হিন্দুরাই বা ব্রিটিশ বিভেদনীতির শিকার হল কেন? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচিত হতে পারত। এমন-কি এই বইয়ের "বিচ্ছিন্নতাবাদ" পরিচ্ছেদেও তার হদিশ মিলল না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কথা বারবার বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, লৌকিক ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। তাঁর মতে এই সমন্বয় নিশ্চয় টেঁকে নি, কারণ পুনরুজ্জীবনবাদের আলোচনার ক্ষেত্রে পঞ্চাননবাবু উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধী সত্তার দিকটি তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই সমন্বয় ও বিরোধের মূল সূত্রটি অনালোকিত থেকে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে পুনরুজ্জীবন-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে হিন্দুত্বের সাধনা না বলে ভারতীয় ঐতিহ্য-সাধনার কাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে জন-সমক্ষে দেশীয় প্রাচীন গৌরবকে তুলে ধরার যে প্রয়াস বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা গিয়েছিল সেখানে সংকীর্ণ অর্থে শুধুই ধর্মচর্চা হয়েছে তা বোধ হয় ঠিক নয়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর বা হিন্দু কলেজ-কেন্দ্রিক আন্দোলনে আধুনিকতার স্পর্শ ছিল, ঠিক তেমনি আলিগড়ের সৈয়দ আহমেদও তাঁর প্রাথমিক সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে আধুনিকতার স্রোত বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য উল্লেখ্য যে, উভয় আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের মানুষের কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। আন্দোলন ও তার ফল উপরতলার মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্ভোগের ভাগীদার হয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের মানুষ। উচ্চবর্ণের সাম্প্রদায়িক কলকাঠিতে আটকা পড়ে জীবনান্ত হয়েছে সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের। উচ্চবর্ণের মানুষ একান্তভাবে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছেন তা আমরা জানি, এ সম্বন্ধে অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে, কিন্তু বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্গের মানুষ যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী এবং সমস্ত রকম দুর্ভোগের ভাগীদার, তাদের সম্পর্কে এই বইতে আলোচিত হলে শিরোনামের 'নতুন ভাবনা' শব্দ দুটির ব্যবহার হয়ত সার্থক হত।

পঞ্চাননবাবু এই বইটি লেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন; অনেক বই, পত্র পত্রিকা, রিপোর্ট দেখেছেন; ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পুনরুল্লেখে কণ্টকিত এই বইটি শুধুই চর্বিতচর্বণ এবং লক্ষ্যহীন বিন্যাস। অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে তাঁর দৃষ্টি। ধোঁয়াশায় তাঁর নতুন ভাবনার পথ হারিয়ে গেছে। আমরা আশা করব, পরবর্তী সংস্করণে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আর-একটু চিন্তা ভাবনা করে শোনাবেন নিজস্ব বক্তব্য।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা—পঞ্চানন সাহা / ২৭জি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ / ৫০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ : অন্য উদ্ঘাটন

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসংস্কৃতির কষ্টি পাথর। উচিত-অনুচিতের সোনা-পেতল নিয়ে কোন ধন্দ লাগলে রবীন্দ্রনাথের চোখে একবার দেখে নেওয়া। মুশকিল হচ্ছে দুপক্ষের রিভাইভালিস্টরা মাঝে মাঝে তাঁর উপর পুরু করে ভেদবুদ্ধির প্রলেপ এমনভাবে লাগিয়ে দেন যাতে সাধারণ মানুষ মনে করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ বেশ জাঁদরেল এক হিন্দু কবির নাম। অতএব এককালের পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ চালু করেছিলেন বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে হাস্যকর সব সব সেন্সর বিধি। এখানে বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদের একাত্মতা-যজ্ঞের রথ হিন্দুরাষ্ট্রের দিকে চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্নছত্র গায়ে জড়িয়ে 'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা। মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা'...এই সব ধরনের সাম্প্রদায়িক অ-ব্যবহার ও অপব্যবহারের অগ্নিপরিধির মধ্যে রবীন্দ্র সমালোচকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কত ভাল কবিতা লিখতেন এ-সব বোঝানো ছেড়ে তাঁকে রচনা-সমুদ্র ছেঁকে প্রয়োজনে তুলে দেখাতে হয় বরফের বাকি ন'ভাগ অংশ। দুর্ভাগা এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার দড়িটানাটানির দিনে যদি কেউ সত্যনিষ্ঠ গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে প্রসঙ্গ ও পরিমাণগত দিক থেকে দেখান মুসলিম জীবন ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনাগ্রহের অপবাদ সত্য নয় এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যাটিকে তিনি 'সর্বকালের মানব-বিবেক শিহরিত সাগ্রহ দৃষ্টিতে'ই দেখেছিলেন এবং এই মামলায় তাঁর সর্বোচ্চ রায় ছিল এই রকম—'যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে একপাশে সরিয়ে দিলেই দেশের মঙ্গল-প্রচেষ্টা সফল হবে, তাহলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়।' (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) কেউ যদি এই মানব-বিবেকের ভুল বোঝাবুঝিতে কণ্টকিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে অনুধাবনা বুঝতে আমাদের সাহায্য করেন তাহলে সত্যি আমরা কৃতার্থ হই। এই প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করেছেন বাংলা দেশের এক রবীন্দ্রগবেষক ডঃ মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া 'রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ' নামক একটি গ্রন্থ লিখে।

গ্রন্থটি মিতায়তন কিন্তু সুখপাঠ্য, তথ্যবহুল কিন্তু কণ্টকিত নয়। এখানে রয়েছে মোট ছ'টি প্রবন্ধ। 'রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন' নামক প্রথম নিবন্ধে লেখক সন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম উপাদান ও প্রসঙ্গ পরিমাণগত দিক থেকে যথেষ্ট। প্রথম দিকে মুসলিম প্রসঙ্গ কম থাকলেও ক্রমশঃই তার অনুপাত বেড়েছে। দু চারটি অপ্রসন্ন মন্তব্য তিনি করেননি তা নয় তবে মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মমত্বময় আগ্রহই সুপ্রচুর। হিন্দুমুসলিম সমস্যাটিকে তিনি পরস্পর-সাপেক্ষ অখণ্ডতায় বুঝেছিলেন ও বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'কালান্তর : ধর্ম ও স্বরাজ' নিবন্ধে মজিরউদ্দীন কষে দেখিয়েছেন অনধিক সতেরোটি প্রবন্ধে মুসলিম প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 'আশীর্বচন ও বিনয় সম্ভাষণ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাধিক বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিককে নানাভাবে উৎসাহদান করেছিলেন। (পৃঃ ৬৩) আবুল ফজলের 'চৌচির' উপন্যাস পড়ে এক দীর্ঘ চিঠিতে (৬-৯-৪০) তিনি লেখেন 'শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেননি এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব···বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না।' (পৃঃ ৬৮) নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক নিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ নিবন্ধ রয়েছে এখানে। 'বসন্ত' গীতি-নাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।' 'চরণতলে বিশাল মরু : রবীন্দ্রনাথ ও মধ্যপ্রাচ্য' নিবন্ধটিতে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি কবির রোমান্টিক আকর্ষণ ও সত্তর বছর বয়সে পারস্য-ইরাক-ইরান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও নব্যতুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্কের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ মনোভাবের বিবরণ। ভ্রমণকালে তিনি লক্ষ করেছেন, 'দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে, তুরস্কে, ইরাকে, পারস্যে ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটা গাছ উঠে পড়ে হিন্দুর সীমানায় মুসলমানের সীমানায়।' (পৃঃ ১২১) বাগদাদের পৌর উদ্যানে সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন 'আমরা যে দেশের সন্তান হইনা কেন···মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাথতে হবে।' (পৃঃ ১২৫) 'রবীন্দ্রকাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ-সঞ্চয়ন' নামক শেষ নিবন্ধটি সংক্ষেপের মধ্যে চমৎকার একটি রচনা।

রবীন্দ্র ব্যবহৃত শ' দুই আরবি-ফারসি শব্দ তুলে দেখানো হয়েছে ইতিহাসের ধারাপথে যে সব আরবি ফারসি শব্দ বাংলাভাষার নিকটজন হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ তাদের খোশ-মেজাজেই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন ছুঁৎমার্গিতা ছিল না।

অধ্যাপক মজিরউদ্দীন মিয়ার গ্রন্থটিতে যা আছে তার মূল্য খাটো না করেও বলা যায় অতিকথন ও মিতকথনের দোষ অল্পাধিক এতে বিদ্যমান। যেমন 'নিবেদন' অংশে লেখক দাবি করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রথম অগ্রদূত'। 'নিবেদনে' ব্যাখ্যার অবকাশ নেই বলে বিস্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতে হবে এমন নয়। 'প্রথম অগ্রদূত' বললে এ বিষয়ে রামমোহন বা দারা শিকোহ্-র পূর্বতন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা একেবারে অস্বীকৃত হয়ে যায়।

লেখক যদিও বলেছেন 'রবীন্দ্র চেতনায় মুসলিম সমাজ' কোনও সুপরিকল্পিত গবেষণা-গ্রন্থ নয়, তথাপি এই ধরনের একটি পরিব্যাপ্ত সামাজিক বিষয়কে রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিপ্রতিভার ব্যাপার হিসেবে না দেখে যদি সমাজেতিহাসের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যেত তাহলে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এবং উপজীব্য সমস্যা উভয়ের প্রতিই সুবিচার করা যেত; ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাখ্যার অস্বচ্ছতাও দূর হত। যেমন, রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মুসলমানের জন্য 'ইংরাজের স্তনে ক্ষীর সঞ্চার' এবং হিন্দুর জন্য 'পিত্তসঞ্চার' হয়েছে। লেখক এ মন্তব্যকে 'দুঃখজনক প্রক্ষেপ' বলে কুণ্ঠা সহকারে পেরিয়ে গেছেন (পৃঃ ২২)। সমালোচনা হচ্ছে বিজ্ঞান। সেখানে 'প্রক্ষেপ' বলে কোন কথা নেই। এ হচ্ছে ব্যাখ্যার দুর্বলতা। লেখক যদি শুধু রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে না দেখে বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমানের জীবনে দ্বিভঙ্গ উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষিত থেকে উক্তিটিকে দেখতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস দৃষ্টিতে তাঁর চমৎকৃত হবার কথা ছিল। একটু খুলে বলি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত হিন্দু সমাজের জাগরণের তুলনায় মুসলমান সমাজের জাগরণ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে মুসলমান সমাজ যখন দৌড় শুরু করে তখন হিন্দুদের ইংরাজ প্রীতির 'ফলিং অ্যাকশন' শুরু হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই উত্থান-পর্বে ইংরাজরা ঝুঁকে পড়ে মুসলমান সমাজের সঙ্গে গলাগলি সম্পর্কে। জয়ন্তী মৈত্র তো স্পষ্টই বলেছেন মুসলিম লীগ ছিল pro-British and anti-Hindu (মুসলিম পলিটিকস ইন বেঙ্গল)। এই জাগরণগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে বুঝতে অসুবিধা থাকে না রবীন্দ্রনাথ কেন মুসলমানের জন্য 'ইংরাজের স্তনে ক্ষীর সঞ্চার' ও হিন্দুর জন্য 'পিত্ত সঞ্চার' বলেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে দুটি সমাজের জাগরণগত মনস্তত্ত্ব ছিল চরম অ্যান্টিক্লাইমেক্সের মধ্যে। বঙ্কিম ছিলেন এই মানসপর্বের সাহিত্যিক। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি জানা থাকলে বোঝার সুবিধা হয় উনিশ শতকের শেষ দশকে কবির কিছু প্রবন্ধে কেন অপ্রত্যাশিত বক্তব্য থেকে গেছে (পৃঃ ২২)। ভুলে গেলে তো চলবে না হিন্দু রেনেসাঁসের ভেতর থেকেই অঙ্কুরিত হতে হয়েছিল তাঁকে। ঘুড়ি কি পারে সুতো লাটাইএর নিয়তি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে? প্রথম দিকের উল্লেখ-স্বল্পতা ও কিছু কঠিন উচ্চারণ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পারলেন মুসলিম জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত করতে সে বিবরণকেও স্থাপন করা যেত দুটি সমাজের প্রগতিশীল ধারার পরস্পরস্পর্শী আগ্রহের ক্রমবিকশিত প্রেক্ষিতে। তাহলে 'আশীর্বচন ও বিনয় সম্ভাষণ' এবং রবীন্দ্র নজরুলের দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক বিষয়ক নিবন্ধ দুটিকে অন্য তাৎপর্যে দেখা সম্ভব হত। রবীন্দ্র-নজরুলের দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক কি কেবল দুই ব্যক্তি-কবির মৈত্রী-মনান্তরের গল্প? লেখক দুটি সমাজের পরস্পরছেদী মানসবিন্দু হিসাবে সেই দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রহরটিকে একেবারেই দেখেন নি। দেখেননি বলেই ত্রিশের দশকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' রবীন্দ্রনাথকে যে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা দান করেছিলেন সেই বিবরণটিকে তিনি এমন একখানি গ্রন্থেও অনুল্লেখিত রেখে দিলেন। রক্ত গোলাপ দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রবীন্দ্র সম্বর্ধনার পথ ও মঞ্চ। এক সমাজের জাগরণ সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আরেক সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভূকে বরণ করেছিল সেদিন। মুসলিম সমাজের 'মুক্তবুদ্ধি' আন্দোলনকারীদের এই রবীন্দ্র সম্বর্ধনার তাৎপর্য অনুধাবন করলে হয়ত শেষদিকে মুসলিম সমাজ ও জীবন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রচেতনার মাত্রাবদলের একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যেত। এ গ্রন্থে যার একান্ত অভাব।

এতদসত্ত্বেও বলি 'রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ' রবীন্দ্র গবেষণার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ও জোড়ালো সংযোজন। এমন একটি বই প্রকাশ করে 'চারুবাক' প্রকাশনী যথার্থ সময় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থে প্রবীর সেন বর্ণিত ছিমছাম প্রচ্ছদটি বেশ রুচিস্নিগ্ধ।

ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে

'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে একটি পর্দা টাঙিয়ে গিয়েছিলেন 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। ভিতরে প্রবেশ করি সে সাধ্য ছিল না একেবারে।' অতি-শ্রদ্ধা বশতঃ আমরা বলাবলি করেছি ইনি এমনই এক-জন মহৎ কবি যিনি নিজের অক্ষমতা কবুল করতে ভয় পান না। বিনয় আর স্বীকারোক্তি যে এক নয় এই কথাটাই আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। ভুল ঘনিয়ে উঠেছিল আর এক দিক থেকেও। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি ও মহর্ষির পুত্র জমিদারী চালানোর কাজে শিলাইদা, পতিসর, কালী-গ্রাম গেছেন ঠিকই কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবেন কী করে? ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা যে নতুন জমিদার শ্রেণীর উত্থান নিশ্চিত হয়েছিল বংশবৈগুণ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বন্দোবস্তের এক ফলভোগী মাত্র। ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত কৃষক সভায়' মুঠো হয়ে ওঠে ঐ বন্দোবস্তে বঞ্চিত কৃষকদের হাত। আপাত দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল তার বিপরীত মেরুতে। অতএব…

সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কোষ্ঠীবিচারের যান্ত্রিকতা সম্পর্কে মার্কসের আশঙ্কা ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও সেই ভুলটাই আমরা জাঁকিয়ে তুলেছি। খতিয়ে দেখার দরকার মনে করি নি জমিদারের কঞ্চি-কণ্টকিত বংশ গৌরব ছুলতে ছুলতে রবীন্দ্রনাথ নামক আশ্চর্য মানুষটি কীভাবে নিজেকে সৃষ্টিতে ও সম্ভবপর সক্রিয়তায় কৃষকের অন্ধের যষ্টি ও লড়াকু লাঠিতে পরিণত করে আগে ভাগেই বসেছিলেন। ডঃ কান্তি গুপ্তকে ধন্যবাদ 'রবীন্দ্রনাথ : ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' নামক একটি গ্রন্থে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অনুসন্ধান খুব বিস্তৃত নয়, আয়োজন খুব বিপুল নয়, অথচ একটা চিন্তাযোগ্য উদ্ঘাটন। বিশল্যকরণী চেনা থাকলে আর গন্ধমাদন বয়ে আনতে হয় না। গুটি ছয়েক প্রবন্ধ নিয়ে প্রায় বানিয়ে তোলা একটি বই। চারটি প্রবন্ধে নাট্য পরিক্রমা, ছোট গল্প ও শিশুকাব্য-ছড়া নিয়ে একটি করে প্রবন্ধ এবং একটি ভূমিকা।

লেখক উদ্ধৃতির সহযোগে দেখিয়েছেন নানান উপলক্ষে জমিদারী বৃত্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ও আক্রমণ ঝলসে উঠেছিল।

'জমিদারের জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারা-সাইট, পরাশ্রিত জীব।'…(পৃ. ১৩)

প্রজাদের অবস্থা তিনি এই ভাবেই জানতেন—

'আমাদের ভদ্র সমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোক সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষি-তেছে, গুরু ঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁঠ কাটিতেছে, আর তাহারা সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার উপায় নাই।' (পৃ. ২৭)

কী করবেন কবি এখানে এই অপার দারিদ্র্য সংসারে? —'এই সব মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। 'রথযাত্রা'য় শূদ্র-দলপতি বলছেন, 'আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমরাই বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।' (পৃ. ৩৬) ভদ্রলোকের মসৃণ ভারতবর্ষে কেমন জমিদার তিনি যিনি ছন্দে বেঁধে বিদ্রোহের প্ররোচনা জোগান?

মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পালাইবে ধেয়ে;

খাজনা দেব না বলা মানেই তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খারিজ করা। ১৯০৮ সালে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রবীন্দ্র-নাথ কৃষক নেতা ধনঞ্জয়ের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য—

'প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রায় দুবছরের খাজনা বাকি —দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না। এত বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।…

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়।' (পৃ. ৫৯)

অন্তরঙ্গ চিঠিতে, পারিবারিক নির্দেশে, ব্যক্তিগত দিন-লিপিতে, ভ্রমণ প্রসূত সংকল্পে, আবেগমথিত কবিতায়, চিন্তাময় প্রবন্ধে, সূচিবিদ্ধ ছোটগল্পে, শিশুপাঠ্য ছড়ায়, এবং বক্ষ বিদীর্ণ নাট্য সংলাপে অভিব্যক্ত এক অন্য রবীন্দ্রনাথ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) থেকে কৃষক সভা (১৯৩৬), প্রশাসনিক অধিকার থেকে সংগ্রামী সংগঠন, ঔপনিবেশিক গড়নের ভেতর আমাদের আর্থ সামাজিক জীবনের এই বহি-র্নাটকটিকে আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছি, কিন্তু জানা হয়নি সমাজ ও শ্রেণী-তত্ত্বের কোন সূত্রবলে দ্বারকানাথ থেকে দেবেন্দ্রনাথ পেরিয়ে জমিদার রবীন্দ্রনাথের ভেতর জন্ম নেয় আরেক রবীন্দ্রনাথ। সমাহৃত উক্তি ও উদাহরণ দিয়ে ডঃ গুপ্ত দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর 'ঐকতান' কোন স্বীকারোক্তি নয়, বিনয় মাত্র। মহৎ মানুষের আত্মসমীক্ষায় আক্ষেপ ও বিনয়ের সুর যে একটু চড়াই থাকে—বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' বা মাইকেলের 'আত্মবিলাপ'-এর পাঠকদের তা অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেই সত্যটা বুঝে নেওয়া। সমাহৃত এই উদ্ঘাটনের সামনে আমরা এখন যা চাইতে পারি তা সাহিত্যিক নয়, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। একটি পরিবারের ভিতর দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথে যে সমাজতত্ত্ব কাজ করে—তার সমূহ নির্ণয়। কেননা লোকটা শুধু কবিতা লিখে ঠকিয়েছে তা তো নয়, বংশ পরিচয় নিয়েও ঠকিয়েছে। 'মুক্তধারা'র মত জমকালো তত্ত্ব নাটকে লুকিয়ে চুরিয়ে পরিবেশন করে গেছেন আপন পরিবারেরই কথা। দ্বারকা নাথকে রণজিৎ সাজিয়ে নিজে নিয়েছেন যুবরাজের পার্ট। রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডকারখানা দেখে দ্বারকানাথ যা বলতে পারতেন রণজিৎ তা বলেছে অভিজিৎকে নিয়ে 'ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি আছে।…পিতামহদের আমল থেকে নন্দি সংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে।' সঞ্জয় বলেছে, 'বুঝতে পারছিনে, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?' অভিজিৎ বলেছে, 'সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।'

রবীন্দ্র চেতনায় মুসলিম সমাজ—ডঃ মহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া / চারুবাক / ইউ-৬২ এস. এইচ. রোড, কলকাতা-১৮ / ৩২ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ : ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে—ডঃ কান্তি গুপ্ত / পরিবেশক পুস্তক বিপণি, ১৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭৩ / ৩০ টাকা।

বাংলা গল্প উপন্যাসে বিহারের লোকজীবন

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা গল্প উপন্যাসে ভৌগোলিক অবস্থান সচরাচর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায় না। তুলনীয়ভাবে ইংরেজি কথাসাহিত্যে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তার কারণ হয়ত এই যে, ইংরেজ বা আমেরিকানরা কাজে হোক অকাজে হোক দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত, বাঙালি স্বভাবত ঘরকুনো। এদিক থেকে বাঙালি লেখকেরও অভিজ্ঞতার পরিধি সীমিত। শিকার কাহিনী। ইতিহাস-আশ্রিত উপাখ্যান আর ভূতের গল্প রচনায় পরিবেশের দিকে মন দিতেই হয়, না হলে গল্প বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তা বাদে আর সব সৃজনশীল লেখায় আমরা চরিত্র ও ঘটনার সংঘর্ষ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সংঘাত, মন নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি—এই সবই দেখে আসছি। গ্রামাঞ্চল আমাদের সাহিত্যে প্রধান উপজীব্য ছিল এক সময়, যতদিন তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অটুট ছিল। এখন আর তা নেই। এখন বাঙালি জীবন কলকাতা আর তার শহরতলিগুলিতে নিবদ্ধ, লেখকের মনোযোগও তার জটিলতা আবিষ্কারে আকৃষ্ট। এর বাইরে কী ঘটেছে, তা জানার আগ্রহ লেখক-পাঠক কারুর নেই। ভিন্নরাজ্যের সাহিত্য অনুবাদ আমরা পড়ি না, প্রতিবেশী বাংলাদেশের গল্প উপন্যাস কলকাতার বাজারে দুর্লভ, কেন না তার চাহিদা নেই। কলকাতাবাসী জনপ্রিয় লেখক একটু পাশ ফিরে তাকালেও দার্জিলিং, পুরী কি সাঁওতাল পরগণার বাইরে নায়ক-নায়িকাকে যেতে দেবেন না। একে যদি কূপমণ্ডুকতা বলতে চান ত বলুন।

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে অবশ্য অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। বিহার রাজ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলতে চান যে, বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি লেখক অনিবার্যভাবে সেখানকার জীবন থেকে উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে বিহারের লোকজীবন যে-পরিমাণে বাংলা সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে, আর কোনও রাজ্যের সামাজিক পটভূমি তার একাংশও পায় নি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র, তারপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং সুবোধ ঘোষ পর্যন্ত তাঁর গবেষণার ব্যাপ্তি যেহেতু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তার পরে আর লেখক অগ্রসর হন নি। আর একটু এগিয়ে এলে এই তালিকায় বিমল কর, প্রফুল্ল রায় এবং মহাশ্বেতা দেবীর প্রসঙ্গও যুক্ত হত। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর বৃত্তে আলোচিত হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী ও তাঁর গঙ্গাজলসই অনুরূপা দেবী, যিনি বস্তুত মজঃফরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। আর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যাঁর লেখায়, বারিদবরণ চক্রবর্তীর মতে, বর্তমানের লোকজীবন এসেও আসে নি, অনতিদূরত্বে থমকে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। সেই সময় থেকে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত। ১৮৩৩-এ কলকাতা শহর হল ভারতের রাজধানী। ১৯১২ সালে রাজধানী সরে গেল দিল্লিতে, বিহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হল বৃহৎ বঙ্গ থেকে। তখনও বাঙালি উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও সরকারি আমলাদের প্রতাপ কমে যায় নি। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিহারের জনসাধারণ নিজস্ব আইডেনটিটি খোঁজায় তৎপর হয়। জেগে ওঠে বাঙালি-বিদ্বেষ। শিক্ষিত বাঙালির দল ইংরেজদের অনুকরণে বিহার ও ওড়িশায় একপ্রকার ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, অধিকার করেছিল সমাজের উঁচুতম আসনগুলি—এক শতকের অধিককাল ব্যাপী তাদের একচ্ছত্র উন্নাসিকতা থেকেই বস্তুত বিহারকেন্দ্রিক নাগরী সাহিত্যের উদ্ভব। আলোচিত সাহিত্যিকগণ অধিকাংশই স্থানীয় লোকজীবনে প্রবেশ না করে তাদের সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকে বাঙালি জীবনচর্যার আলোচনাই করে গেছেন, গ্রন্থকার এইরকম অভিযোগ করেছেন।

অংশত এ-অভিযোগ সত্য। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্ব জুড়ে আছে বিহারের ভাগলপুর, পাটনা ও নিকটবর্তী অঞ্চল। স্থানীয় প্রকৃতি ও লোকজীবনের বর্ণনায় এসেছে ভুট্টার খেত, মাচার ওপরে বসে বিহারি চাষীদের নুনো শুয়োর তাড়ানোর তৎপরতা। দেখা গেছে মহামারী আক্রান্ত পশ্চাৎপদ গ্রামজীবনের ছবি। সেই সব দেহাতি মানুষ সরল, দরিদ্র, পরিশ্রমী—একবার চারপাই আশ্রয় করলে অঘোরে ঘুমোতে পারে। এই সব ব্যাপার মূলত বাঙালি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, বাঙালি মানসিকতার ওপর নির্ভর করে বিহারিদের দেখা হয়েছে। প্রভাতকুমার তাঁর বিচিত্র রসের গল্পে বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজনে বিহারের পরিমণ্ডল এনেছেন কোথাও কোথাও। স্থানীয় মানুষদের প্রতি চারুরে প্রবাসী বাঙালির তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক ভাবে উঠে এসেছে, সেই সঙ্গে উল্টোটাও সত্য, সম্পন্ন বিহারিদের বাঙালি বিদ্বেষ—তাঁর লক্ষ্য সমাজ চর্চা ত ছিল না, তাই লোকজীবন যাকে বলে তার পরিচয় আমরা পাই নি। পরশুরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল অবাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধূর্ত শঠতা আর নির্লজ্জ জীবনযাপনের দিকে। ধনী উচ্চশ্রেণীর বিহারিদের সামন্ততান্ত্রিক আচরণের দিকেও, তিনি সেই ক্ষেত্র তন্নাশ করে বুদ্ধিমান বাঙালির মত কৌতুকের নকশা তুলে এনেছেন। মূলত ফোঁকটা বহির্গাতর চোখ দিয়ে একটি বিশেষ সমাজকে দেখা। এই আমার জন্মভূমি, এই আমার দেশ, ভেবে অনেকেই বিহারকে গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যেমন বনফুল এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী। সুবোধ ঘোষ দীর্ঘকাল, কিন্তু বাকি তিনজন প্রায় আজীবন বিহারেই বসবাস করেছেন। সুতরাং তাঁদের লেখায় ইতস্তত বাঙালি চরিত্র ও বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ এলেও প্রধানত অভিজ্ঞতার কারণে স্থানীয় সমাজ, তার সমস্যা ও অসংগতি বাধ্যতামূলকভাবে এসে পড়েছে। যাদের সঙ্গে বসবাস, নিত্য ওঠাবসা, তাদের কথাই ত লেখক লিখবেন। এঁদের বিশেষ গুণ, সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতার প্রতি উদাসীন থাকতে পেরেছেন, আত্মীয় ভেবেছেন প্রতিবেশীদের যারা হিন্দিভাষা ভাষী, তাদের সুখের কথা, তাদের শোষিত জীবনের অসহায়তা, কুসংস্কার, অশিক্ষিত সরল তাঁদের নারীকুল, তাঁদের নীচতা উদারতা সব কিছুই বাংলাভাষার মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পেরেছে। এই সব লোকজনকে আমরা ভালো করে চিনি না। কিন্তু এদের জন্য সহানুভূতি বোধ করি।

এই নির্লোভ আন্তরিকতার কারণে, আমার ধারণা, এঁরা বড় মাপের লেখক হয়েও বাংলা সাহিত্যের মেইনস্ট্রিম থেকে একটু দূরে থেকে গেছেন। অনেক সাহিত্য সমালোচক বিহার প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করে থাকেন, কেন না তাঁদের সাহিত্যকর্মে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথা, কলকাতার জটিল জীবন বিধৃত হয় নি। এই মনোভাব

ন্যায়সঙ্গত নয়। বনফুলকে প্রসঙ্গত আমি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক বলে মনে করি। তাঁর কল্পনাপ্রতিভা ও বিচক্ষণতা অন্ত অনেক সমকালীন খ্যাতিমানদের চেয়ে বেশি তীব্র। তবু আমরা যখন এক নিঃশ্বাসে মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিন বাঁড়ুজ্জের কীর্তি নিয়ে গর্ব করি, তখন বনফুলকে আমাদের মনে পড়ে না। তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ীও, তাঁর জাগরী, ঢোঁড়াইচরিতমানস সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু পাঠকের, প্রকাশকের প্রশ্রয় পেয়েছে কিনা সন্দেহ। বোম্বেমিয়ান জীবন ছেড়ে সুবোধ ঘোষ চলে এসেছিলেন কলকাতায়। তারপরও অনেক সাড়াজাগানো গল্প লিখেছেন বিহারের পটভূমি নিয়ে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সে-সব রচনায় রোমাঞ্চকর পরিবেশ আর চমক সৃষ্টি ছাড়া আর বিশেষ কোনও তাৎপর্য খুঁজে পান নি। পান নি লোকজীবনের কোনও সমাজ তাত্ত্বিক পরিচয়।

এই লোকজীবন ব্যাপারটাই গোলমেলে। ইংরেজিতে যাকে folk (ফোক) বলে, এ যদি তাই হয়, তাহলে বলব এই রাজনীতি রঞ্জিত নিরিখে সাহিত্যের বিচার হওয়া অসঙ্গত। বারিদবরণ চক্রবর্তী এই গ্রন্থে উল্লিখিত লেখকবৃন্দকে কতখানি স্থানীয় লোকজীবন স্পর্শ করেছেন, তার চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে রসের আলোচনায় তেমন মন দেন নি। তার ফলে শরদিন্দু, প্রভাতকুমার, উপেন্দ্রনাথের প্রতি খানিকটা অবিচার করা হয়েছে বলে মনে হয়। সরকারি প্রকল্পের রূপরেখায় কাজ করার এই এক ঝকমারি।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন (গল্প ও উপন্যাস)—বারিদবরণ চক্রবর্তী / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ / ৪২ টাকা।

ওপার বাংলার তিনখানি কবিতা সংকলন

সুজিৎ ঘোষ

কবিতায় কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারি

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙলাদেশের মানুষের কাছে এক অসাধারণ এবং অদ্বিতীয় দিন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে দেশ বিভাগের পরে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চরমে পৌঁছায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের রক্তদানোনা পথ ধরেই বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম। ফলে জাতীয় চৈতন্যের গভীরে 'একুশে' এক যূথ-আবেগের ঝর্নাধারা, যে ধারায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরাও একাত্ম। হৃত রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতায় সাধারণ মানুষের 'একুশের' ঐতিহ্যে প্রতি খুব বেশি মনস্কতা লক্ষ করা যাবে না। কিন্তু শিল্প সাহিত্যের দর্পণে 'একুশে' বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপের প্রতিফলন, 'একুশে'ই ওপার বাঙলার সাহিত্যে বুদ্ধিজীবী বিবেকের অন্তঃপ্রহরী।

স্বভাবতই 'একুশে' ফেব্রুয়ারি ওপার বাঙলার কবিদের কাব্যে অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধের আলম্বন বিভাব। 'একুশে' নিয়ে রচিত পঞ্চাশ জন কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার 'বাংলা একাডেমী' প্রকাশ করেছে 'একুশের কবিতা'। ভাবগত ঐক্যে, বলা চলে, পঞ্চাশটি কবিতা যেন একটি কবিতা। শুধু বাঙলাভাষী পাঠকদের কথা না ভেবে, এই গ্রন্থে পাশাপাশি পৃষ্ঠায় রয়েছে ইংরেজি অনুবাদ, যাতে ইংরেজি-জানা পাঠকের কাছেও পৌঁছতে পারে। ভূমিকায়ও বলা হয়েছে, "একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভোলা যায় না। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যা কিছু সুন্দরতম, যে মৌল ভিত্তির ওপর এ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের জীবন ও চেতনার সাথে যা সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য, একুশে তারই প্রতীক। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে আজ আমাদের যে পরিচয় একুশে ছাড়া এ পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। প্রায় দু'শ বছরব্যাপী শাসনের পর ইংরেজরা যখন ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ ছেড়ে যায় তখন একটি অলীক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।···বাংলা অবশেষে অন্ততম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা লাভের আগেই তা ঘটেছিলো। অলীক রাষ্ট্রটির টিকে থাকার কোনো উপায় ছিলো না এবং তা টিকেও থাকে নি।"

সংকলনের প্রথম কবিতা জসীম উদ্‌দীনের, "আমার এমন মধুর বাংলাভাষা / ভায়ের বোনের আদর মাখা / মায়ের বুকের ভালোবাসা।"—জসীম উদ্‌দীনের কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন কবি সহজভাষায় ভাবকে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারেন, যদিও তাঁর

কবিতায় নাগরিক বৈদগ্ধ্য নেই। সুফিয়া কামালের কবিতায় "অমর একুশে / অজেয় হয়েছে বাংলা ভাষা রক্তে মিশে।" আহসান হাবীবের চোখে "কথারা যখন / জননীর কণ্ঠ থেকে মালা হয়ে ঝরে—/ ঝরে ফুল / কথার বকুল / আমাকে জড়ায় / তখন কেবল / জানি আমি কথারাই জননী এবং জন্মভূমি।" সিকানদার আবু জাফরের কবিতায় "কালো পতাকায় / প্রাচীর-পত্রে। অশ্রু-তরল রক্তরঙের লিপি / ক্রোধের / ঘৃণার / ভয়াল বিস্ফোরণ / একুশে ফেব্রুয়ারী।" —একটি-দুটি শব্দের সংক্ষিপ্ত চরণে উচ্চারণের দ্রুত চালটি একুশের ক্রোধ-ঘৃণা-প্রতিরোধের ক্ষিপ্রতাকে মূর্ত করে তোলে। আবুল হোসেনও একুশের দ্রুতি ফুটিয়ে তোলেন অনুরূপ ভাবে, "হাজার হাজার খেলা / মাঠে / ঘাটে / হাটে / বাটে / খড়ের পাতার ঘরে।" সানাউল হকের কবিতায় ভাষা ও ভাবের বৈদগ্ধ্য লক্ষ্য করা যাবে, "কবেকার সেই চেনা শিল্পী—স্বাগতমা / সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে / রাবীন্দ্রিক গান গেয়ে / শব্দকে জাগাতো সুরের হৃদয়ে।"—ভাষার-সুরের ইন্দ্রজাল রাষ্ট্রিক সীমা তাঁর কবিতায় অতিক্রম করে যায়। আবদুল লতিফের কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি আঞ্চলিক উপভাষার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, "সইমুনা আর সইমু না / অন্য কথা কইমু না / যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান। / সেই জানের বদলে রাখুম রে / বাপ দাদার জবানের মান।" জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সমগ্র কবিতাই মন্ত্রের গাম্ভীর্য লাভ করেছে, "একুশের অমোঘ মিছিলে / বার বার মিশে যাই।… আমাদের শোকযাত্রা, নিঃশব্দ মিছিল, ক্রমাগত / এগোয় সর্পিল পথ ধরে। অন্ধকারে / ফাল্গুনের রাতের আকাশে কাল-পুরুষ / কেন জাগে, আমরা জানি না। কেন রাত কেটে গেলে সূর্য ওঠে, নির্বিকার, রক্ত মুখ, আমরা জানি না / কেন ব্যথা জমে হয় শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ, আমরা জানি না / কেন দুঃখ বয়ে যায় কবিতার চরণে চরণে— / আমরা জানি না।" শামসুর রাহমানের কবিতাটি এপারে দীর্ঘদিন থেকেই পরিচিত, তাঁর নাগরিক বাক্ এই কবিতায়ও স্পষ্ট, "আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখি তারা।… তোমার মুখের দিকে আজ যায় না তাকানো. / বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।" হাসান হাফিজুর রহমানের তুলনামূলক দীর্ঘ কবিতায় আন্তরিক উচ্চারণ, "আজ তো জানতে এতটুকু বাকী নেই মাগো, / তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও।" সংকলনের অন্যতম হৃদয়স্পর্শী কবিতা আলাউদ্দিন আল আজাদের 'স্মৃতির মিনার'—"ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর / বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।" কায়সুল হক দেখেছেন, "সোনা রঙ আশা আনে / ছাখো, দৃঢ় দুই হাতে —/ নাচাতে-নাচাতে।" আবদুল গাফফর চৌধুরীর কবিতায় ক্রোধ-ঘৃণার তীব্রতার সঙ্গে শপথ, "দারুণ ক্রোধের আগুনে জ্বালবো ফেব্রুয়ারী / একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী।" আর জাফর ওবায়দুল্লাহর অনুভবে, "এখন, / মার চোখে শিশির ভোর, / স্নেহের রোদে / ভিটে ভরেছে।" সৈয়দ শামসুল হক ডাক দেন, "এসো, ছিনিয়ে নি আমাদের স্বাধীনতা, / কথা বলবার স্বাধীনতা, অক্ষরের / ডান পাশে অক্ষর বসিয়ে শব্দগুলো / তৈরী করবার স্বাধীনতা…।" বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতায় শহীদের স্বর শ্রুতিগম্য হয়ে ওঠে, "এখনো / এখনো যে বরকতের আর্তনাদ গুলীর আওয়াজে / অণু দুরন্ত আক্রোশে বার বার খুনীকে খোঁজে।" মোহম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতায়, "সবার প্রাণের ভাষা—মাতৃভাষা সত্তার সম্মানে / অম্লান ঐশ্বর্যময় হয়ে রয় মৃত্যুঞ্জয়ী গান।" আবু হেনা মোস্তাফা কামালের কবিতায় হার্দ্য উচ্চারণ, "মা, তোমার উষ্ণ কোলে আহত অবুঝ মাথা রেখে / আমি শুধু শুয়ে থাকবো, আমার সোনালী লম্বা চুলে / তোমার নিঃশ্বাস ঢেউ তুলে যাবে, আমি আজ কিছুই করবো না / শুধু / চেয়ে চেয়ে দেখবো এক অলৌকিক গর্বে দীপ্ত সম্রাজ্ঞীর মতন তোমাকে।" ফজল শাহাবুদ্দীন একুশেকে দেখেছেন, "মুক্তির মতো স্বাধীনতার মতো প্রতিশোধের মতো / এই একটি দিন।" মোহম্মদ মনিরুজ্জামানের অনুভব, "তোমাদের স্নেহে প্রেমে আষাঢ়ে আশ্বিনে / ভাইবোন মায়েদের স্মরণীয় দিনে / অবিচ্ছিন্ন তাদের হৃদয়।" আল মাহমুদের সংক্ষিপ্ত কবিতাটি স্মরণীয় আবেগের সংহতিতে, "তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল / রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখে উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে / তীরের ফলার মত / নিক্ষিপ্ত ভাষার চীৎকার / বাঙলা, বাঙলা…আমার মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।" ওমর আলীর কবিতার বাঙলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্যের অভিন্ন সম্পর্ক বিবৃত, তাই তাঁকে প্রশ্নাকুল দেখি, "অ থেকে ৮ফেলে দিয়ে শিখি অন্যভাষা / বাঙালীর গর্ব, বাঙালীর আশা কি করে বাঁচাই?" হুমায়ুন চৌধুরীর কবিতায় তাঁর ভাষার জন্যে, "সেই অন্তিম ঘৃণার দিকে-মুখ ফিরিয়ে সেই কেয়ামতের মতো শব্দের দিকে কান রেখে / আমি অপেক্ষায় আছি, / আমি অপেক্ষায় থাকবো।" শহীদ কাদরীর কবিতার বয়ান নাগরিক,

আবেগের চেয়ে মস্তিষ্কের কাছেই কবিতাটির আবেদন, কিন্তু একুশের কেন্দ্রগত ভাবে, ভাষার প্রতি দরদে তাঁর কবিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন তিনি বলেন, "অর্থাৎ যখনই চীৎকার করি / দেখি, আমারই কণ্ঠ থেকে / অনবরত / ঝরে পড়ছে অ, আ, ক, খ"। মোহম্মদ রফিকের কবিতায় প্রশ্ন উঠে আসে, "নিজাম কবর খোঁড়ে ছমিরের লাশ লুকোতেই / একুশ ভুলেছো তুমি, একুশ কী তোমাকে ভুলেছে?"—কবির এই প্রশ্ন আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, যখন একুশের উত্তরাধিকারকে মুছে দেবার জন্য ষড়যন্ত্রে চলছে। "বায়ান্নোয়" সিকদার আমিনুল হক ছিলেন "হাফ-প্যাণ্ট পরা এক বালক" যখন "জানতাম না ঘাতক ও শহীদের দূরত্ব। / তবু বিক্ষুব্ধ মানুষের উচ্চারিত শ্লোগান ছিলো আমার কাছে / ঝোড়ো রাত্রির সমুদ্র /…আর তাকে অবৈধভাবে বাধা দিচ্ছে / বর্শার মতো ধারালো ঢেউ।" একুশের কালে আসাদ চৌধুরীও ছিলেন বালক, ফলে বয়স্ক কবিদের মতো তাঁর একই বিষয়ের কবিতায় ঘৃণা-ক্রোধে নেই, তাঁর কবিতার চাল হালকা, "ফাল্গুন এলেই অলি এসে জোটে / কলিরা পায় লোটে / বলবে তাকে শহীদ মিনার? বলো।" মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুক কবির, হুমায়ুন আজাদ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মুহম্মদ নুরুল হুদা—এঁদের সকলের জন্ম ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯-এর মধ্যে। একুশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটা সরে এসে এঁদের কবিতার জগতে প্রবেশ—ফলে, একুশের অনুভব এঁদের অনেকের কবিতায় তুলনায় বিমূর্ত। কিন্তু, বিমূর্ততার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের কবিতা উৎকর্ষে ন্যূন, যেমন, মহাদেব সাহার কবিতায়, "আমি পুনরায় আকাশখানিরে চেয়ে দেখি / নক্ষত্রপুঞ্জের মৌন মেলা, / মনে হয় এঁকেবেঁকে উঠে যাবে আমাদের / ছিন্নভিন্ন পরাস্তজীবন, অবশেষে বহুদূরে দিগন্তের দিকচিহ্ন মুছে দিয়ে / ডাক দেবে আমরাই জয়ী।" নির্মলেন্দুর কবিতায়ও একই রকম বিজয়ীর বিশ্বাস,—ব্যক্তিকবি অতঃপর যে ভাষার অনুধ্যানে অমরত্বের আস্বাদ পেতে চান, "তোমার পায়ের নীচে আমিও অমর হবো / আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।" প্রকৃতপক্ষে এই ঐকান্তিক বাসনাই ধ্রুবপদ হয়ে কবিতাটির সর্বাঙ্গে এক মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে। হুমায়ুন কবিরের কবিতাটি মাত্র নয় পংক্তির, সংহতভাব,—"মিনার চূর্ণিত হলে জেগে ছিল অন্তিম সাহস।" তিনি একুশের মিনারকে আলম্বন করে দেখেছেন, "মার্চের রাতে কালো নক্ষত্র নীচে / মানুষের কোনো দীপ্ত বাসনার নীল কড়িকাঠে / হিমঘুণ লাগাতে পারে নি।" এই কবিতায়ও "মিনার চূর্ণিত হলে" শব্দগুচ্ছ বার বার ধ্রুবপদের মতো ব্যবহৃত হয়। হুমায়ুন আজাদের কবিতাও ঐতিহ্য-সচেতন নাগরিক মননে সমৃদ্ধ, শব্দ প্রয়োগে তাঁর সতর্কতা লক্ষণীয়, কিন্তু প্রেরণার উৎসের অখণ্ডতায় তাঁর কবিতায় আমরা পাই "তোমার 'অ, আ'-চিৎকার সমস্ত আর্য শ্লোকের চেয়েও পবিত্র অজর"। তুলনায় হাবীবুল্লাহ সিরাজী তাঁর কবিতায় নানা চিত্রকল্পে, "ফেব্রুয়ারী" শব্দটির ধ্রুবকল্প ব্যবহারে বাহান্নর পরিবেশটি ধরতে চেয়েছেন, "ফেব্রুয়ারি / কোনো মাস নয়, কোনোদিন নয় / কোনো গ্রাম নয়, কোনো পথ নয় / কোনো ফুল নয়, কোনো গাছ নয় / আকাশও নয়, নদীও নয় / পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে / অবিরাম কথা বলা।" মুহম্মদ নুরুল হুদার ছয় পংক্তির কবিতাটি সুন্দর, "মানুষেরা নদী নয়, মানুষের বুকে তবু নদীর পিপাসা : /…নদীর শব্দের শব্দের সাথে জেগে থাকে মানুষের প্রিয় মাতৃভাষা।" দাউদ হায়দার এবং শিহাব সরকারের জন্ম ১৯৫২ সালে, দাউদের কবিতাটিতে স্মরণের প্রাধান্য, "এই ঘাস এই মাটির বুকে পা রেখো আস্তে করে, / এখানে আমার ক'টি ভাই রক্তাক্ত শরীরে শুয়ে আছে।" শিহাব সরকারের কবিতায় বক্তব্য, "রাত বারোটা এক মিনিটে / মিনার মূলত যাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায় / তার ওপরে ব্যাপ্ত বরফের হিমে / শুয়ে আছে কয়েকজন নিতান্ত শহীদ"। নিতান্ত শহীদ! শেষ সুরে কোথায় বাজে অপূর্ণতা।

একুশের স্মরণে নিশ্চয় আরও কবিতা লেখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবু 'বাংলা একাডেমীর' এই সংকলনটি দামে কম হলেও মহার্ঘ।

আর, ভাষান্তরের ক্ষেত্রে সব সময়ই সমস্যা দেখা দেয়, কবিতার ভাষান্তর প্রায় অসম্ভব। তবু, প্রতিটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদের প্রয়াস নন্দিত হলেও, কিছু প্রশ্ন থাকে। যেমন :

'অমর একুশে
অজেয় হয়েছে বাংলাভাষা রক্তে মিশে।' (সুফিয়া কামাল)
অনুবাদে : Ekushey is now mixed with blood
and the Bengali tongue
It is now unconquerable by any.

মনে হয় কবির কাঙ্ক্ষিত অর্থ, একুশে 'অমর' বলেই 'অজেয়' হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে একুশের 'অমর'ত্বের শর্ত বাদ পড়ে unconquerable হয়েছে। মূলের জোরও নষ্ট

হয়েছে।

'কালো পতাকায়
প্রাচীর পত্রে
অশ্রু-তরল রক্ত রঙের লিপি
ক্রোধের
ঘৃণার
ভয়াল বিস্ফোরণ
একুশে ফেব্রুয়ারী' (সিকান্দার আবু জাফর)

—ওপরের স্তবকটির ব্যঞ্জনার শক্তি স্তবক নির্মাণের মধ্যেও বেড়েছে, কিন্তু অনুবাদ লক্ষ করুন:

February 21 is the tearing explosion
of rage, of hatred,
with her black flags, posters and blood-red
scribblings of tears.

মূল কবিতায় 'কালো পতাকা'র প্রতিরোধে, অশ্রু মোচনের উপসংহারে, পরিণতিতে এসেছিল ক্রোধ ও ঘৃণায় জাত 'ভয়াল বিস্ফোরণ'—অথচ অনুবাদে মনে হয় বিস্ফোরণের, ক্রোধের, ঘৃণার পরিণামে আসে অশ্রু! কিন্তু, কবির উদ্দিষ্ট অর্থ নিশ্চয় তা নয়!

'মাঠে
ঘাটে
হাটে
বাটে' (আবুল হোসেন)

—এর অনুবাদে
In fields
River-fronts
Villages,
Markets—ইত্যাদি।

কিন্তু 'ঘাট' কি River-fronts? গ্রাম বাঙলায় ঘাট পুকুরের হতে পারে, নদীরও হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জনায় 'ঘাট' শুধু স্নান করার বাসন মাজার স্থান নয়,—গ্রামীণ মহিলাদের সর্বপ্রকার ভাবের আদান-প্রদান-ক্ষেত্র। আর, নদীর ঘাটও অবশ্যই River-front নয়, যেমন 'বাট' Villages নয়—পথ।

মূল কবিতা একবারই লেখা হয়, অনুবাদ একাধিকবার হতে বাধা নেই। অনুবাদ-প্রচেষ্টা একাধিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই মূলের ভাব-সঞ্চারী সম্ভাব্যতম সাফল্যের দিকে এগোতে পারে। 'একুশের কবিতা'র অনুবাদে সেই সুযোগ এখনও রয়ে গেছে।

'একুশের কবিতা' সংকলনটির 'ভূমিকা'টি মূল্যবান এবং শেষে কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। আমরা, যারা কাছের হয়েও দূরের পাঠক, তাদের কাছে কবিদের পরিচয়-লিপিটি পরবর্তী কাব্যপাঠে সহায়ক হবে।

শেষ মন্তব্য: সংকলনে মহিলা কবিদের সংখ্যা মাত্র এক—বেগম সুফিয়া কামাল। অথচ 'একুশে' থেকে মুক্তিযুদ্ধ,—বাংলাদেশে নারীদের ভূমিকা ত বিশাল এবং মহান। কবিতায় তাঁদের উপস্থিতি নেই কেন?

'অচঞ্চল বিনম্র বিবাগী': শামসুর রাহমান

১৯৭১-এ বাঙলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় এপার বাঙলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শামসুর রাহমানের 'বন্দীশিবির থেকে' এবং 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' কাব্য দুটি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত ও গৃহীত হয়েছিল। আধুনিক কবিতার একটি সাধারণ সমস্যা এই যে, বাঙলা কবিতায় কবির সংখ্যা যত বেড়েছে, সেই অনুপাতে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। কিন্তু, এখনও কাব্যপাঠে মনস্ক যে পাঠক মণ্ডলী, তাঁরা অসংখ্য কবিদের মধ্যে থেকে ভাল কবিদের এক সময়ে নির্ভুল ভাবেই চিনে নেন। এভাবেই আমরা এই বাঙলার কবিতার পাঠকেরা ওপার বাঙলার কবিদের মধ্যে থেকে শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলাম।

১৯৯২-এ ফেব্রুয়ারিতে শামসুর রাহমানের দুটি কাব্য-গ্রন্থ 'খণ্ডিত গৌরব' এবং 'ধ্বংসের কিনারে বসে' প্রকাশিত হয়েছে। 'বন্দী শিবির থেকে' এবং 'নিজ বাসভূমে'র পর্বেই শামসুর রাহমান কবি হিসেবে নিজেকে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করেছিলেন,—নাগরিক-বাক্ অথচ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষা, চিত্র-রূপকল্পের অজস্রতার সঙ্গে পরিমিতি এবং গভীর দেশপ্রেম তাঁর কাব্যভাষাকে স্বতন্ত্র করেছে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য, ওপার বাঙলার অন্যান্য অনেক কবির মতোই তাঁর কবিতায়ও আমরা পরিব্যাপ্ত আশাবাদ প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯৭১ থেকে ১৯৯২-এর দু'দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেছেন শামসুর রাহমান, ভাষায়-ছন্দে এই বিশ বছরে নিজেই নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করেছেন। কবিতার রূপাঙ্গিকে নিয়ে এসেছেন, নানা সূক্ষ্ম স্বরায়ন—যে বিবর্তন তাঁর মধ্যপর্বের কাব্যগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করলে আমাদের অনুভবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং সে-সুযোগ

গ্রন্থ-পরিচয়ের পরিসরে যদিও নেই, কিন্তু আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থ দুটিতে পরিণত কবির স্বাতন্ত্র্যের দ্যুতি আমাদের চোখ এড়ায় না। 'ধ্বংসের কিনারে বসে' তেষট্টিটি এবং 'খণ্ডিত গৌরব' সাতান্নটি কবিতার সংকলন। কবিতার প্রতি গভীর প্রেমে এ-কাব্যে কবি পুরোন এবং আধুনিক কালকে একাকার করে নেন, "...কেউ দেখে না, শোনে না / কিছু, শুধু নিজে জানি, তুমিহীনতায় / তুমি থাকো পবিত্র সৌরভ হয়ে এবং তোমার করতলে / লোর্কার কমলালেবু, ঠোঁটে নেরুদার প্রজাপতি। / আমার পাঁজর ফুঁড়ে রক্তের ফোয়ারা টেবিলের / গোলাপকে আরো বেশি লাল করে তোলে আর দেওয়ালের সাদা / থেকে পেরেকের ক্ষতচিহ্নসহ / নিঃশব্দে ওঠেন জেগে যীশু, / তর্জনী উঁচিয়ে / আমাকে দেখিয়ে দেন ক্রুশকাঠ, উচ্চারিত হয় / 'বও, বয়ে যাও তুমি বিরাম বিহীন'। গলগোথা / গন্ধে ভরে যায় ঘর, লাল জোব্বা, হায়, / পড়ে আছে পুরোনো মেঝেতে, বুড়ো খুড়ো / কারো খুব কুঞ্চিত ললাটরেখা, কে এক নারীর / দু'গালে গড়িয়ে পড়ে কী করুণ পানি! কারা যেন / জুয়ো খেলে চলে গেছে, দিব্যকান্তি গাঁথা ক্রুশকাঠে।" কত সহজেই আবিশ্ব মানুষের বেদনা যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলেন শামসুর রাহমান! মানুষের দ্বারা মানুষের বঞ্চনার প্রকাশ—'কারা যেন জুয়া খেলে চলে গেছে দিব্যকান্তি গাঁথা ক্রুশকাঠে।' চিত্ররূপকল্পের নানা বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যে কাব্য দুটি উজ্জ্বল—'অথচ শাশ্বতীর ছলনার শাড়ির দিকে / পৌষ সংক্রান্তির দিনে কাটা ঘুড়ি ধরতে যাওয়া বালকের হাতের / মতো বাড়ানো আমার ব্যাকুলতা', 'কখন ভোকাট্টা চাকরির প্রবঞ্চক ঘুড়ি', 'গ্রীষ্মের গেলাস টলমলে', 'হঠাৎ পুঁতির মালা দুলে ওঠে কিশোরীর, পুঁথি-পাঠ করে / ঘাসফুলে বুলিয়ে আঙুল আর আঁচলে লুকিয়ে / কিছু কুল ঘরে ফেরে।' 'কঙ্কাল সংস্কারের শেকল ছিঁড়ে ছুটে আসবে তুমি' 'ন্যাংটো শিশু দাওয়া ছেড়ে ধাওয়া করে হাঁসের 'পংক্তিকে, জিপসি মেঘের শোভা'—ইত্যাদি অসংখ্য প্রাত্যহিকের সমাহারে সৃষ্টি করেন এক চিত্ররূপকল্পের জগৎ, মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্চকিত না হয়েও কানে আনে ধ্বনির আরাম।

প্রকৃত পক্ষে, এই কাব্যগ্রন্থ দুটির থেকে শামসুর রাহমানের পূর্ববর্তী অনেক কবিতার স্বাতন্ত্র্য মনে হয় এখানেই যে, আগের কবিতায় তিনি বক্তব্য প্রকাশে যত উচ্চকিত উচ্চারণের পক্ষপাতি ছিলেন, এখানে এসে কণ্ঠস্বর অনেক হার্দ্য। বক্তব্যেও আগের মতো তীব্র আশাবাদের স্থানে নৈরাশ্যের ছোঁয়াচ—দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতের অভিঘাত কবি চেতনায় স্বনিত:

'...হায়েনারা মানচিত্র নিয়ে
স্বেচ্ছাচারী, নেকড়ের পালের কামড়ে
ফালা ফালা স্বপ্নের পতাকা। কখন যে
নিজেই নিজের বমি হাভাতের মতো গিলি খেয়াল
থাকে না। (শ্বাস-প্রশ্বাস)

অথবা, 'ভাঙাচোরা পূর্ব ইউরোপ কি সারানো যাবে
রাংঝালে
কবিতার স্বায়ত্ত শাসন কি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের
পোড়োবাড়িতে
পরাবাস্তবতার মৃত্যুঘণ্টা কি বাজলো
বনকপোতের ডাক কবে শুনবো আবার

স্বৈরতন্ত্রের কটমটে পাহারা আর কতকাল
ক'জন পুতুল মন্ত্রী নিলেন শপথ দবিজ কার্পেটে
দাঁড়িয়ে
যে ডোরা কাটা শার্দুলের সওয়ার গর্বাচভ
সেই কি খাবে তাঁকে আখেরে।' (কিছু না কিছু
নিয়ে)

বা, 'ওরা চায় তুমি নতজানু হও সর্বদাই,
ওরা চায় আজ তোমার কলমে ধরুক ঘুণ
তোমার এমন প্রেমিক হৃদয় ছিন্ন হোক
শকুন-শোভিত ভাগাড়ে তোমার হোক ঠিকানা'
(ওরা চায়)

'...সে পানিতে খাই
হাবুডুবু, ভেসে যাই, চলে হাঙরের স্বৈরাচার।'
(আমি কি এমনই নষ্ট)

'...অথচ আমাকে দিচ্ছো ঠেলে ক্রমাগত
দ্রুত ফ্যাসিবাদী ফুটোহীন গ্যাস চেম্বারের মতো
কুঠরিতে, পারছি না নিতে আর সহজে নিঃশ্বাস।'
(খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে)

এ-রকম অবস্থায় কবি প্রত্যক্ষ করেন:

'...দাউ দাউ বনভূমি। ডানদিকে সাপ ছোটে,
বাম দিকে সন্ত্রস্ত নেউল, নেকড়েরা অকস্মাৎ
মেষপাল, বৃক্ষগুলি জ্বলন্ত পাথরে মাথা কোটে।'
(দাবানল)

মানবিক অবক্ষয়ের পাশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বদেশের বেদনা

ভাষা পায় 'ধ্বংসের কিনারে বসে' নামাঙ্কিত কবিতায় ;

'...এ কেমন আত্মসমর্পণ ?
তাহলে কী করে বলো আমার হৃদয়ে উঠবে জেগে
সূর্যস্তোত্র ধ্বংসের কিনারে বসে বিচূর্ণ বেলায় ?'

কিন্তু এই নৈরাশ্যের উৎসমূলে থাকে স্বদেশ,—

'আমার কবিতা এই তো নীলিমা ছুঁলো
হোক সে সকল দুঃখীর প্রিয় মাতৃভূমি।' (ওরা চায়)
'আমার হাতে একলব্যের রিক্ততার হাহাকার,
কে আমাকে বলে দেবে
কোন দ্রোণাচার্যের পায়ের তলায়
লুটোচ্ছে আমার খণ্ডিত গৌরব ?' (খণ্ডিত গৌরব)
'অকস্মাৎ আকাশে কে যেন দিল ঢেলে কালো কালি
দুপুর সন্ধ্যায় সাজ পরে বিধবার মতো চোখ
মেলে চেয়ে থাকে তার আঁচলে সংগ্রামী স্মৃতি জেলে
মিলনের মুখে বৃষ্টি নয়, বাংলার অশ্রু ঝরে।'
(মিলনের মুখ)

এই দুঃখবোধ, গভীর শোকানুভূতিই এই দুই কাব্যগ্রন্থের অবশ্য শেষ কথা নয়। আরোপিত আশাবাদের উচ্চারণ এখানে নেই সত্য, শামসুর রাহমান বলেছেন, 'অলীক আশার বাণী শোনাতে আসি নি। গেছি ভুলে / সেই মায়াবৃক্ষ, আশা যার নাম'—কিন্তু সোচ্চার তীব্রতা কমলেও, তাঁর কবিতা প্রতিবাদ হারিয়ে ফেলেনি, বরং আরোপিত আশাবাদ নয় বলেই যেন সে-প্রতিবাদ গভীরতর :

'...দেশটার
চোখ গেছে খুলে, চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল এখন
গনগনে লোহা। এবার
সত্যি সত্যি হবে লড়াই।' (আসলে তা নয়)
'...সামনের
দিকে পা চালাও, দাও ডাক দশদিকে
এমন জোরালো কণ্ঠে যাতে
বজ্রেরও লজ্জায় মুখ বন্ধ হয়ে থাকে।' (থমকে থেকো না)
'ভাবিস নে গেলো সব চুকে বুকে,
রক্তে নেই রক্তে নেই তোর
যদি না রুখে দাঁড়াস। ছাপ চেয়ে স্বচক্ষে
তোর দোরগোড়ায় তিনটি দাঁড়াশ।' (কৃষ্ণপক্ষ)
'...যন্ত্রণা সাপ-কামড়ানোর যন্ত্রণা আপদমস্তক
চামড়া কুঁড়ে গলগল বেরোয় বিষ। কাঁহাতক আর
সইবে সে ?' (কাঁহাতক)

মানুষ হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসের পাশাপাশি কবির কবি হিসেবে অস্তিত্বের, সংগ্রামের পথও শামসুর রাহমান এখনও সন্ধান করে চলেন, লেখেন,—'শব্দের কাঙাল আমি অন্ধের মতো আমার পথ হাতড়ানো।' (বাংলা শব্দতত্ত্ব) এবং এই পথ হাতড়ানোর ফলেই, 'কী আশ্চর্য আমার সম্মুখে/ উন্মোচিত কবিতার স্তন, নাভিমূল। ভয় হয় / যদি সে হারিয়ে যায় কুয়াশায় তবে / কাকে খুঁজে বেড়াবো সর্বদা।' (ভয় হয়) তাই কবির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, 'নাছোড় সাগ্নিক কবি পাক নব বাক্যের বিভূতি।' প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত কবিতাগুলি ছাড়াও, দুটি কাব্যগ্রন্থেই অধিকাংশ কবিতাই ভাল লাগবে। পাখি, হরিণী কবিতা, আগুনে রেখেছ হাত, স্বপ্নজীবী, বুদোয়ার (খণ্ডিত গৌরব), কাল এবং আগামীকাল, সতীদাহ, অলৌকিক সেতু, সংখ্যালঘু, মৃতেরা কি করবে ক্ষমা (ধ্বংসের কিনারে বসে) প্রভৃতি কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'ম্যাগাজিনে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎকার পড়ে' (খণ্ডিত গৌরব) এবং 'শামসুর রাহমানের সঙ্গে' (ধ্বংসের কিনারে বসে) কবিতাদুটি একত্রে পড়লে এক ভিন্ন মাত্রায় আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

পরিণত কবি 'প্রত্যাখ্যান' (ধ্বংসের কিনারে বসে) কবিতায় এক সমাহিত শমে এসে পৌঁছান :

'বর্বরের হুঙ্কারে, দাপটে ওঁৎপাতা প্রাণ, প্রিয়
সুহৃদেরা বহুদূরে। বাচাল বৃদ্ধের
তিরস্কার জোটে নিয়মিত ; স্বেচ্ছাচারী তরুণেরা
দেবে অর্ঘ অকাতরে করিনা প্রত্যাশা। আত্মলোপী
ঈগলের আচরণে নিভৃত চূড়ায়
আমৃত্যু থাকতে হবে নৈঃসঙ্গের হিমেল ঝাপটে ;
বেলা শেষে এই দণ্ড সহজে নিয়েছি মেনে ; রূঢ়
প্রত্যাখ্যানে অচঞ্চল, বিনম্র, বিরাগী।'

একুশে কবিতা—বাংলা একাডেমী ঢাকা / ৩০ টাকা।
খণ্ডিত গৌরব—শামসুর রাহমান / বিউটি বুক হাউস, ঢাকা / ৫০ টাকা।
ধ্বংসের কিনারে বসে—শামসুর রাহমান / বিউটি বুক হাউস, ঢাকা / ৫০ টাকা।

ভর্তৃহরির শতক ত্রয়

ভবানী গাঙ্গুলী

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের একটি অনুবাদ গ্রন্থ। বাংলাসাহিত্যে মূল সংস্কৃতভাষার অনাদরের যুগে এই অনুবাদ গ্রন্থটি এক সার্থক সংযোজন। গ্রন্থটি অতিপ্রাচীন হলেও এর বিষয়বস্তু আধুনিক। যেখানে জীবন সেখানেই এই বইটির বড় আদর।

এই গ্রন্থে তিনটি শতক রয়েছে—নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক। কে এই ভর্তৃহরি ? এ প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যাওয়া না। একথা অনুবাদিকা শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ গোড়াতেই স্বীকার করেছেন। এর মূল কারণ বোধহয় এই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, আদর্শকেন্দ্রিক। তাই জীবনভিত্তিক এই শতকত্রয় কালজয়ী হয়ে আজ বাংলাভাষাতে অনূদিত হলেও লেখকের সঠিক পরিচয় আমরা পাই না।

শতককাব্য আমাদের ভারতের দেবদেবীর শতনামের সামাজিক কাঠামোকে মনে পড়িয়ে দেয়। সেই ধর্মভিত্তিক চালচিত্রের নিচে দাঁড়িয়ে কবি জীবনভিত্তিক এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ আমাদের উপহার দেন। তাঁর মনে আমাদের মানবসমাজের বৈচিত্র্যের মূল হচ্ছে জীবন ধারণের তিনটি ধারা। লেখকের ভাষায়—

"বৈরাগ্যে সঞ্চরত্যেকে নীতৌ ভ্রমতি চাকারঃ।
শৃঙ্গারে রমতে কশ্চিদ্ ভুবি বেদাঃ পরস্পরম্॥"
(শৃ. শ. ১০৩)

অর্থাৎ 'একজন বৈরাগ্য আশ্রয় করে বিচরণ করছেন, অপরজন নীতিমার্গ অবলম্বন করে ভ্রমণ করছেন, অন্য কেউ শৃঙ্গাররসের অনুভূতিতে আনন্দ লাভ করছেন। এভাবে পৃথিবীতে মনুষ্যগণ পরস্পর ভেদবিশিষ্ট।'

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের অন্যেক কবির কাছে নীতি, শৃঙ্গার ও বৈরাগ্যের চিরন্তন ধারা বয়ে চলেছে। কবি তাঁর নিজের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেগুলি অনুভব করে, সুনিপুণ শব্দচয়নের মাধ্যমে তাদের নান্দনিক রূপ দিয়েছেন।

শ্রীমতী ঘোষ অনুবাদের প্রারম্ভেই শতককাব্যগ্রন্থের বিশদ ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন যা গবেষকের পক্ষে মূল্যবান তথ্য। প্রতিটি শতকের অনুবাদের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার কাঠামোটি অভিনব। আরও কথা, এই প্রকাশনে আমরা মূল গ্রন্থসহ অনুবাদ পাই। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণও বটে। এতে শ্লোকগুলির সন্ধিবিযুক্তপাঠ এবং অন্বয়মুখে পাই রয়েছে। মূল গ্রন্থপাঠে আগ্রহী যাঁরা, তাঁরা এর ফলে সহজেই এই দুষ্প্রাপ্য মূলগ্রন্থের রসাস্বাদন করতে পারবেন। লেখিকা আলাদা করে প্রতি শতকের প্রত্যেকটি শ্লোকের ছন্দের নামও উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে বলি বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে আমরা যখন বিভেদহীন এক বিশ্বমানব সমাজ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করছি তখন এই মূল গ্রন্থটি অথবা অনুবাদটি সকলেরই একবার পড়া উচিত। আমরা বলি মানুষ কি কেবল অর্থ দিয়েই মানুষকে বিচার করবে ! ভর্তৃহরিও সেই সুপ্রাচীন যুগে বলেছেন—"সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তে"—'সকল গুণ স্বরর্ণকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়।'

শৃঙ্গারশতকে এসে আমরা দেখতে পাই যৌবনে এসে ভোগের স্পৃহা মানুষকে মোহমুগ্ধ করে এবং বাস্তবের প্রতিঘাতে সেই মোহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রবঞ্চনায় বীতরাগ কবি ছুটে চলেন বৈরাগ্যের দিকে।

এরপর জন্ম হয় বৈরাগ্যশতকের। এই বৈরাগ্যশতকে কবি চেষ্টা করেছেন অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের এক প্রশস্ত পথ সৃষ্টি করতে। এখানে কবি ভোগ্যবস্তু ত্যাগের ও কৃষ্ণ সাধনার কথা সুললিত ছন্দে উপদেশ দিচ্ছেন। এ যেন 'কান্তাসম্মিত তয়োপদেশ'। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে উচ্চারণ করছেন—

"মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এষ ভবতামন্তাঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসংগবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্মল—
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি॥

অনুবাদ—'হে জননী পৃথিবী হে জনক পবন, হে সখা অগ্নি, হে সুবন্ধু সলিল, হে সহোদর আকাশ, তোমাদের সকলকে জানাই এই শেষ প্রণামাঞ্জলি। তোমাদের সাহচর্যের প্রভাবে জাত যে পুণ্য তার ফলে প্রোজ্জ্বল নির্মল জ্ঞানের উদয় হেতু সমস্ত অজ্ঞানতিমির দূরীভূত হওয়ায় আমি পরম ব্রহ্মে বিলীন হই।'

ভর্তৃহরি বিরচিত শতক ত্রয়—যূথিকা ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ / ৪২ টাকা।

১৪০০

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "আজি হ'তে শতবর্ষ পরে" পড়িয়া

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি ক'রেছিলে আমাদের শত অনুরাগে,
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে !
* * * * *
তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি,
—হে কবীন্দ্র, অনুরাগ-ভরে !
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিত-গান সজল নয়নে !
আজো হায়
বারে বারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন,
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্মরে
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল পড়ে ঝ'রে ঝ'রে !
* * * * *
তোমা হতে শতবর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি,
হে কবীন্দ্র, অনুরাগ-ভরে !
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে !
চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরী !
করি চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হয়ে, গান হয়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙ্গীলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল—বিহঙ্গের যত গান—যত রক্ত-রাগ

তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ !
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হ'য়ে মাতিয়াছে আমাদের যৌবন-মেলায় !
* * * * *
শত বর্ষ পরে আজি, হে কবি-সম্রাট।
এসেছে নূতন কবি—করিতেছে তব নান্দীপাঠ !
উদয়াস্ত জুড়ি' আজো তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিয়াছে নব নব।
তাহারি সে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী।
* * * * *
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি ক'রেছিলে নবীনের রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কলম হ'য়ে তব পদতলে !

মনে হয়, আসিয়াছ অপূর্বের রূপে
ওগো পূর্ণ, আমাদেরি মাঝে চুপে চুপে !
আজি এই অপূর্বের কম্প্র কণ্ঠস্বরে
তোমারি বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে—
তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত এই বিরল দৃষ্ট কবিতাটি বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দী সমাপ্তি উপলক্ষে পুনর্মুদ্রিত হল।

জীবনানন্দ : সেদিনের স্মৃতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেনেট হলে (যা পরবর্তীকালে ভেঙে ফেলা হয়) অনুষ্ঠিত কবিসম্মেলন কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে একটি প্রধান ঘটনা। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তর আনুকূল্যে, নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সেই কবিসম্মেলনে সেদিনকার প্রায় সব কবিই নিজ নিজ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। সেখানেই জীবনানন্দ দাশের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওই একদিনই শুনেছি। সদ্যপ্রয়াত লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের মুখে জীবনানন্দের আবৃত্তির প্রশংসা শুনেছি। তাঁর লেখা 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' গ্রন্থে জীবনানন্দ স্মৃতিচারণা নিবন্ধটি পড়েছি। সেখানে জীবনানন্দের আবৃত্তির বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী বাণী রায়।

জীবনানন্দের কণ্ঠ ছিল গম্ভীর পুরুষোচিত, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবেগ। শোনামাত্রই ধরা পড়ত কী অপরূপ মূর্চ্ছনা ও আবেগ সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে স্পন্দিত হয়ে উঠত। এই আবৃত্তি কবি ও কবিতাকে চিনিয়ে দিত। নিজের কবিতা, রবীন্দ্র-কবিতা—প্রাণ দিয়ে তিনি আবৃত্তি করতেন। তাঁর উচ্চারণভঙ্গি ছিল নিখুঁত ও স্পষ্ট। তাঁর গলার স্বরও ছিল ভারি ও মিষ্ট। তিনি নিজে পণ্ডিত ও কবিমানুষ ছিলেন বলে কবিতাপাঠে বা আবৃত্তিতে ছেদ বা বিরামের তারতম্য, ভাষাবেগের প্রয়োগ, স্বরের উত্থান ও পতন অর্থাৎ স্বর কখন উচ্চগ্রামে উঠবে, কখন মধ্যগ্রামে থাকবে, আর কখনই বা নিম্নগ্রামে নামবে—এসবই তিনি ভালভাবে জানতেন। এই সংবাদ আমরা শ্রীমতী বাণী রায়ের উক্ত নিবন্ধে পাই। সেনেট হলে, যতদূর মনে পড়ে জীবনানন্দ পাঁচটি কবিতা পড়েছিলেন। আরও কবিতার জন্য শ্রোতারা অনুরোধও করেছিলেন। মনে আছে, 'বনলতা সেন' কবিতাটিও কবি আবৃত্তি করেছিলেন। সে আবৃত্তি মেয়েলি নয়, ভরাট গম্ভীর আবেগসমৃদ্ধ কণ্ঠ।

তখন (১৯৫৪) জীবনানন্দ খ্যাতির শীর্ষে উপনীত। এক বছর আগে (১৯৫৩) সিগনেট প্রেস 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত (প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯৪২-এ কবিতাভবন থেকে)। ১৯৫২-তেই নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ পুরস্কৃত হয়। সিগনেট প্রেসের সংস্করণটি সুচারু শোভন সুমুদ্রিত। তখন অনেকের হাতে হাতে ঘুরত ওই সংস্করণ। অথচ সেদিন জীবনানন্দ আর্থিক দুশ্চিন্তা ও বাসস্থান-সম্পর্কিত দুশ্চিন্তায় ছিলেন। ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর খড়্গপুর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর সেই কাজে ইস্তফা দেন। ১৯৫২-র নভেম্বর বরিষা কলেজে (অধুনা বিবেকানন্দ কলেজ) যোগ দেন, ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারিতে ইস্তফা দেন। ১৯৫৩ সালেরই জুলাই-এ হাওড়া গার্লস কলেজে (অধুনা বিজয়কৃষ্ণ কলেজ) যোগ দেন। ১৯৫৪-র মে মাসে নাভানা কর্তৃক 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

শ্রীমতী বাণী রায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, জীবনানন্দ দাশ অন্যমনস্কভাবে পথ চলতেন। রাসবিহারী ও সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে অন্যমনস্ক কবিকে দ্রুত হেঁটে যেতে তিনি দেখেছেন। 'দেখা হলে দূর থেকে মৃদু হাসিতে কবি দ্রুত পদক্ষেপে চলে যেতেন। এই অন্যমনস্কতা কেবল কবি-স্বভাবের জন্যই নয়, জাগতিক উপরিউক্ত সমস্যা ও দুশ্চিন্তার জন্যও। আশ্চর্য, আমরা সেদিন এই শ্রেষ্ঠ কবিকে জাগতিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারিনি।'

'জীবনানন্দকে মনে পড়লেই ভেসে ওঠে চোখের সামনে একখানি স্বপ্নাবিষ্ট মুখ, দূরপ্রসারিত দুটি চোখ এবং রহস্যঘন বিষাদে পাণ্ডুর অথচ অম্লান হাসিতে উজ্জ্বল দুটি ঠোঁট। মিতবাক, তর্ক ও বিবাদে অনাগ্রহী, কিন্তু আপন প্রত্যয়ে অবিচল আশ্চর্য একটি প্রতিভাদীপ্ত মানুষ ছিলেন জীবনানন্দ। অকাল প্রস্থিত সেই মানুষটিকে কে না ভালবাসতেন ?' (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ভূমিকা ১৯৭২ রবীন্দ্রনাথ সামন্তের

জীবনানন্দ প্রতিভা)

'অন্যমনস্ক জীবনানন্দ এম্নিতেই ছিলেন। রাস্তায় বুদ্ধদেব বসু পেছন থেকে ডেকে তাঁর সাড়া পাননি—এমন ঘটনাও আছে। পাশাপাশি গনেশ এভিনিউতে হেঁটে দেখেছি, একটি কথাও বলছেন না বা হঠাৎ কী মনে হওয়াতে জোরে হেসেই উঠলেন হয়তো।" (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'কবি জীবনানন্দ দাশ' ১৯৭০)

সেই অন্যমনস্ক কবি, যিনি পৃথিবীতে দেখেছিলেন সূর্যাস্তের রঙিন আলো এসে পড়ে, রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে ট্রাম চাপা পড়ে শেষ হয়ে গেলেন। ট্রাম-ড্রাইভার বারবার ঘণ্টা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সরে যাননি বা যেতে পারেননি। 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শেষ কবিতা (১৩৬১ আশ্বিন সংখ্যা। পূর্বাশা) 'অবিনশ্বর' বেরোয়। তার প্রথম দুটি স্তবক :

তার সাথে আজ সাত আট বছর পরে—অঘ্রাণে
কলকাতার এই টিউব আলো নীয়নদীপের রাতে
দুচার মিনিট দেখা হল……কথা বলা হল :
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।
স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাব কথা
বলা হ'লে ভাবছি ভালো হ'ত ;
কথা আরো গভীরভাবে চেতন হ'ত যদি ;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য করে বলে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

এই কবিতা প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ট্রাম দুর্ঘটনা ও তার ফলে কবির মৃত্যু। ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ দুর্ঘটনা, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ২২ অক্টোবর (১৩৬১ কার্তিক) তাঁর মৃত্যু। বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। সে জীবনের যাত্রা শেষ হল ১৯৫৪-র কলকাতায়।

জীবিতকালে শেষ মুদ্রিত কবিতায় ('অবিনশ্বর', পূর্বাশা, শারদীয়া ১৩৬১) জীবনানন্দের দার্শনিক মন 'আলোকালো'র দ্বৈতবোধে এসে পৌঁছেছিল, এবং স্পষ্টতই তিনি জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়ামের চিন্তায় বলে গিয়েছিলেন—

কোথায় তুমি রয়েছ কোন পাশার দান হাতে
কি কাজ খুঁজে ?

তাই মর্তের পানশালাকেই অবিনশ্বর ভেবে পিঙ্গলা, অশনারা, সাকীর হাতের মৃৎপাত্র থেকে বিষ পান করে গেছেন ('তুমি···মাটিরই ক্রীড়াভূমি')।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"শম্ভুনাথ হাসপাতালে তিন দিন সেই অকপট নীলকণ্ঠকেই দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের তরফ থেকে সেবার ভার গ্রহণ করেন শ্রীমান ভূমেন গুহ প্রমুখ কয়েকজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। জীবনানন্দ হাসপাতালে প্রথম দেখায় বলেছিলেন আমায় : 'এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব ?'……দ্বিতীয় দিন দেখায় বলেছিলেন : 'ডক্টর রায় এসেছিলেন।' পূর্বাশা লিমিটেডের ম্যানেজিং-ডিরেক্টর ও 'পূর্বাশা'র প্রকাশক তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও সজনীকান্ত দাসকে টেলিফোন করে হাসপাতালে ডক্টর রায়কে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, যাতে হাসপাতাল-চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়। সবান্ধব ভূপেনের সঙ্গে 'পূর্বাশার' প্রকাশকও জীবনানন্দের মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। একা, গণেশ এভিনিউর ফ্ল্যাটে, রাত্রি দশটায়, মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আমার মনে হয়েছিল মর্তের বন্দর থেকে একটি জাহাজ শান্তি-পারাবারে চলে গেল। লিখেছিলাম : 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল।'···শেষ দেখার দিনগুলো থেকে জীবনানন্দ আমার চেতনায় স্বপ্ন—তাঁর ছবি আমার কবিতা' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৪৭-১৪৮)।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় দুটি কাব্যগ্রন্থ, একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ ('কবিতার কথা' ১৯৫৫, 'রূপসী বাংলা' '১৯৫৭, 'বেলা অবেলা কালবেলা' ১৯৬১)।

কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয় কয়েকটি সাহিত্যপত্রের জীবনানন্দ-সংখ্যা। তার মধ্যে উল্লেখ্য—'ময়ূখ' (পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২), 'উত্তরসূরী' (পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১), 'সাহিত্যের খবর' (চৈত্র ১৩৬১), 'কবিতা' (পৌষ ১৩৬১) 'হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকা' (১৯৫৫), 'শতভিষা' (১৩৬১, শীত সংখ্যা), 'একক' (১৩৬১, কার্ত্তিক-চৈত্র) 'ক্রান্তি' (১৩৬১ কার্তিক), 'পরিচয়' (১৩৬২ শ্রাবণ), 'দেশ' (১৩৬১, কার্তিক ২১), 'পূর্বাশা' (১৩৬১ কার্তিক, ফাল্গুন সংখ্যা), 'শনিবারের চিঠি' (কার্তিক ১৩৬১), 'উষা' (১৩৬১ কার্তিক)।

'জিজ্ঞাসা' এবং 'প্রাকৃত'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

দুটি পত্রিকা—একটি 'জিজ্ঞাসা', অন্যটি 'প্রাকৃত', 'জিজ্ঞাসা' তেরো বছর ধরে শিবনারায়ণ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে, আর 'প্রাকৃত' ১৯২২-এর অক্টোবরে হাসান আজিজুল হকের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে, 'জিজ্ঞাসা' ভারতের কলকাতা থেকে আর 'প্রাকৃত' বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে প্রকাশিত। ভারত একটি বিশাল দেশ এবং বাংলাদেশ অন্য একটি ছোট্ট দেশ, দুটি দেশই স্বতন্ত্র, সার্বভৌম ও স্বাধীন। কিন্তু দু দেশের দুটি পত্রিকারই ভাষা এক। মানুষের পরিচয় যদি ঘরে কাজে কর্মে ব্যবহৃত ভাষা দিয়ে নির্ধারণ করতে হয় তাহলে সমস্ত বাংলাভাষীরই একটাই পরিচয় দাঁড়ায় বাঙালি হিসেবে। 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯ বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যায় গৌরী আইয়ুব জিজ্ঞেস করেছেন 'কোন বাঙালী ? কে বাঙালী ?' এই প্রবন্ধটিতে তিনি বক্তব্যকে যে-পদ্ধতিতে পরিচালনা করেছেন তারই পাশাপাশি আছে নূরজাহান মুরশিদের প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'। বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের বাঙালি সংস্কৃতির তুলনা বা পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার পশ্চিম বাংলার বাংলার পাঠক সহজেই করে নিতে পারবেন। এটা নিজেদের অর্থাৎ বাংলাভাষীদের পরিচয় বোঝার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। পারস্পরিক সম্পর্কেই বস্তুর মূল্য—যেমন শুধু কলমের মূল্য নেই তেমনই শুধু কাগজেরও মূল্য নেই—পারস্পরিক সম্পর্কেই কাগজ ও কলমের মূল্য। এজন্যে ভারতের বাঙালিদের পক্ষ থেকে 'জিজ্ঞাসা'র বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের বাঙালি এবং ভারতের বাঙালির মধ্যে পারস্পরিক জানাজানি আজ আর শুধুমাত্র আবশ্যক নয়, তা নিতান্তই আবশ্যিক। গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র বিরোধিতা করেন, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহযোগে বিশ্বাসী এবং সহযোগের আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৮৫-তে বম্বের চেম্বুর অঞ্চলের এক বিখ্যাত সমাজ সেবকের বাড়িতে জনৈক হিন্দুত্ববাদীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ তথা মহাভারতের কথা বলেছিলাম বলে ঐ হিন্দুত্ববাদী বলেছিলেন, ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে হিন্দুদের শিক্ষা নিতে হবে—Holy Roman Empire-এর মত Holy Hindu Empire প্রতিষ্ঠা করতে হবে, হিন্দু-রাষ্ট্রই হবে মহারাষ্ট্র, ছুঁড়ে ফেলা হবে গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে এবং সেসঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যও যে পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল সে কথা বলাতে ঐ হিন্দুত্ববাদী বললেন, হ্যাঁ, হিন্দু মহারাষ্ট্রেরও তা হতে পারে, যদি তামিল, গুজরাতি, বাঙালিরা নিজ নিজ ভাষা নিয়ে থাকতে চায় তাহলে তাদেরও ইয়োরোপের মত ভাষার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দেশ বা রাষ্ট্র হবে। ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে এটাও শিক্ষা নেওয়া উচিত—হয় সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইলের হিন্দি-ভাষী হিন্দু মহারাষ্ট্র, যাকে দেখে দুনিয়া থরথর করবে, না হয় ক্ষুদ্রতর হিন্দিভাষী হিন্দু মহারাষ্ট্র আর তামিলভাষী, গুজরাতিভাষী, বাংলাভাষী, পাঞ্জাবিভাষী ছোট ছোট অনেক রাষ্ট্র যারা নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে মরবে। কথাটা তুললাম এজন্যে যে ১৯৮৫তে যেসব কথা একেবারে পাগলের প্রলাপ ছিল ১৯৯৩এ সেসব কথা অতটা প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে না। ধর্ম ও ভাষার প্রশ্ন দুর্জয় মাথা তুলেছে। বর্তমান ভারতে সবচেয়ে বিপন্ন ভাষা হল বাংলা ভাষা। শিব সেনার কাছে বাংলাভাষী মাত্রেই বাংলাদেশী তাছাড়া শুধু কলকাতার দিকে তাকালেও বাংলাভাষীর ভবিষ্যৎ যে কী তারও আন্দাজ পাওয়া যায়।

ভারতের যে ভৌগোলিক পরিসরে বাংলার জাগরণ হয়েছিল, যে ভৌগোলিক পরিসর ছিল ভারতবর্ষের আধুনিকতার স্নায়ুকেন্দ্র সে পরিসরে আজ বাংলাভাষীর সংখ্যা-সংস্কৃতি-স্থান সবই ঘোর সংকটাপন্ন এবং বাংলাভাষীরা যে ঘোর কলকাতা

থেকেই উৎখাত হচ্ছে এ নিয়ে আজ থেকে দু দশক আগে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খেদ যাদের মনে হয়েছিল সংকীর্ণ বাঙালিয়ানা ও হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যে আরোপ করার বিরোধিতাকে যারা প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রদ্রোহিতা মনে করেছিল (জেনে রাখা ভাল যে অন্নদাশঙ্কর, সত্যজিৎ রায় সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারত সরকার সুনীতিকুমার স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশে সম্মত হয় নি) তাদের আজ নতুন করে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা দরকার। গৌরী আইয়ুব খুব সঙ্গত কারণেই অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের নামে বাংলাভাষী নির্যাতনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন। দিল্লির মসনদ দখলের চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে যারা অনুপ্রবেশকারী বহিষ্কারের দাবি তুলছে তাদের কথায় যেসব বাংলাভাষী ভুলছে ও ভুলবে তারা খাল কেটে কুমির আনছে ও আনবে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জন্যে বাংলাভাষা যে বিশ্বের সভায় এক স্বতন্ত্র ভাষা এটাই হিন্দুত্ব-হিন্দি-হিন্দু-বাদীদের কাছে বাংলাভাষীদের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

একটা নজির আছে 'প্রাকৃত'তে প্রকাশিত বদরুল আলমখানের 'পাকিস্তান : ক্রিটিনা ল্যাম্বের নির্মোহ দৃষ্টিতে' শীর্ষক আলোচনায়। এটি আসলে পেন্থুইন বুকস ইণ্ডিয়া প্রকাশিত ক্রিটিনা ল্যাম্বের লেখা 'ওয়েটিং ফর আল্লাহ' নামক গ্রন্থের উপরে আলোচনা। তৃতীয় তথা বিকাশশীল দেশগুলিতে একটা নতুন প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে—একে বলা যায় 'রাষ্ট্রীয় লুম্পেনিকরণ'। কী ভাবে পাকিস্তানে 'রাষ্ট্রীয় লুম্পেনিকরণ' হয়েছে এবং হচ্ছে তার গভীর বিশ্লেষণ আছে এই বইয়ে। রাষ্ট্রীয় লুম্পেনিকরণ শুধু পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ভাবলে ভয়ঙ্কর ভুল হবে। বদরুল আলম খান একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁর মস্তিষ্কাক্রিয়াকে বিস্তৃত করেছেন সমগ্র ভারত উপমহাদেশের উপর। কোথাও ভারত বা বাংলাদেশের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু এত স্বল্প পরিসরেও লুম্পেনিকরণ প্রক্রিয়ার শাখাপ্রশাখা ফুল-ফলের এত স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন যার সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের পাঠক আপন আপন দেশে উদ্ভিন্ন ঐ সর্বনাশা মহীরুহটিকে চিনে নিতে পারবেন। ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যে ভারতও চলেছে পাকিস্তানের পথে এবং ভারতের পরিস্থিতি নিয়েও লেখা যায় 'ওয়েটিং ফর রাম'। 'প্রাকৃতে'র একটি বিশেষ সম্পদ হল স্বয়ং হাসান আজিজুল হকের লেখা সম্পাদকীয়টি। যারা আত্মহননের পথে যাওয়ার জন্যে বদ্ধ পরিকর, যারা মানুষের পরিচয় অস্বীকার করে বাঘ, হনুমান ইত্যাদি জানোয়ারের বংশধর বলে পরিচয়ে গৌরব বোধ করে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু মানুষের পরিচয় পরস্পরকে জানায় ও বোঝায়, উন্নত চিন্তা প্রকাশের জন্যে ভাষার সামার্থ্য বিকাশে, পরস্পরের সাহায্যে সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চায় এবং ব্যবহারিক সমৃদ্ধির সাধনায়। 'জিজ্ঞাসা' ও 'প্রাকৃত'র সম্পাদকদ্বয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে মানুষের মহিমাকে পতাকা করে আমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছেন।

ক্ষত : শিল্পীর প্রতিরোধ

সত্যজিৎ চৌধুরী

গোটা দেশ যেন আজ ঢুকে গেছে ধ্বংসের বলয়ে। নৈতিক মূল্যজ্ঞানের, শুভচেতনার ভিত ধ্বস্ত করে চলেছে এক অন্ধ রোখ্। রাষ্ট্র-সমাজ-সংগঠন সব বিমূঢ় এবং অসাড়, ধ্বংসের এ অভিযান রুখে দেবার সাধ্য নেই কারও। কোথায় দাঁড়াবে মানুষ, কার কাছে ভরসা পাবে এমন দুঃসময়ে! ভাঙনের একেবারে এই কিনারে পৌঁছে কখনও মনে হয়, হয়ত বা পরিত্রাণের দিশা মিলতে পারে কবির কাছে, শিল্পীর কাছে। এ রকম মন নিয়ে আমরা কেউ কেউ ফেব্রুয়ারির (১৯৯৩) শেষে 'ক্ষত' নামে চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখতে গেছি। টান বোধ করাই স্বাভাবিক, কারণ, এ প্রদর্শনীতে একত্রিত ছিলেন ভবেশ সান্যাল-মকবুল ফিদা হুসেন থেকে ওয়াসিম কাপুর-সুনীলকুমার দাস-চিত্রভানু মজুমদার-শ্যামল দত্তরায়-শাকিলা অবধি প্রায় চার প্রজন্মের ৬৬ জন প্রতিনিধি শিল্পীর কাজ। এত বড় এই প্রদর্শনীর কাজগুলি যে মর্ম-সূত্রে গাঁথা—দ্যোতনাময় সেই 'ক্ষত', 'উন্‌ডস্', শব্দটি আমাদের কলাসংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী সকলের মনে প্রতিবাদী শিল্পী সোমনাথ হোরের চরিত্রমূর্তি জাগাবে। শাদা কাগজের মণ্ডের উপরে নানা অস্ত্রে বিদ্ধ ক্ষতের ছাপ তোলা তাঁর বিখ্যাত সিরিজটির একটি এ প্রদর্শনীতে ছিল এবং প্রদর্শনীর অ্যালবামের ভূমিকায় বলাও ছিল—'উন্‌ডস্' নাম সোমনাথ হোরের কাজ থেকেই নেওয়া। ৬৬ জন শিল্পীর কাজের মধ্যে ৫২ জনের কাজ একেবারেই সাম্প্রতিক, ১৯৯২-৯৩-এর। আগে করা কাজগুলিও বিষয় ভাবনার দিক থেকে এ প্রদর্শনীর মর্মের সম্পৃক্ত, তাই সুর কেটে যায় না। বরং আজকের বাস্তবের একটা পূর্ব-সূত্র ধরিয়ে দেয়। কাজগুলি ফিরে ফিরে দেখার সময়ে এবং তারপরেও বহু প্রহর, বহু দিন এই উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়ে থাকে, ভারতীয় মনুষ্যত্বের অন্তর্গত সারবস্তু, শাঁসটুকু পচে যায়নি। যায়নি বলেই ৯১ বছর বয়সে ভবেশ সান্যাল থেকে ২৪ বছর বয়সী পরেশ মাইতি বা শাকিলা এমন করে ধ্বংসের অভিযানের মুখে প্রতিরোধ গেঁথে দেবার গরজ বোধ করেন। জীবনের ভিতের উপরেই শিল্পের আসন। সেই ভিতটিই ভেঙে দিতে উদ্যত যে অন্ধ শক্তি, শিল্পের এবং জীবনের প্রতি দায়ে শিল্পীকে তার সঙ্গে বোঝাপড়ায় নামতে হয়।

WOUNDS, Centre of International Modern Art আয়োজিত প্রদর্শনী ফেব্রুয়ারি-২৬– মার্চ-৭, ১৯৯৩। *"This exhibition represents the response of India's leading artists to the trauma of our times. It is both an expression of anguish at the wounds of the recent past and re-affirmation of the need to heal those wounds."* (*Press note* থেকে).

সমগ্রভাবে এ প্রদর্শনীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে শুরুতেই গুলাম রসুল সন্তোষ-এর আত্মপ্রতিকৃতির ক্যানভাসটি মনে এসে যায়। তন্ত্রমন্ত্রের ছবি নয়, একই ক্যানভাসে সন্তোষ তিন ধর্মের পোশাকে নিজের তিনটি প্রতিকৃতি এঁকেছেন। ছবিটির নাম তাৎপর্যময়। "আই অ্যাম সন্তোষ হু অ্যাম আই টু ইউ।" কী আমার পরিচয়—বিপন্ন ভারতীয়ের সত্তা-পরিচয়ের সংকট সন্তোষ অব্যর্থ ধরেছেন। তাঁর কাজটির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয় এবং একই অভিব্যক্তির তিনটি অবয়বের তিন ধর্মীয় পোশাক যে মূল মানুষকে পাল্‌টায় না কোনো স্তরেই—এই বোধ প্রতিষ্ঠা পায় ক্রমে। প্রবীণতম শিল্পী ভবেশ সান্যাল-এর ছবিটিতে একই সত্তা-পরিচয়ের প্রশ্ন এসেছে যেন-বা একটু শ্লেষের কষ নিয়ে। এক বীর হনুমান দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পট জুড়ে। মাথায় গন্ধমাদন পর্বত নয়, ধরা রয়েছে একই সঙ্গে মন্দির-গির্জা-মসজিদ। বজরঙ্গ দলের তাণ্ডবের সামনে ভবেশ সান্যাল দাঁড় করান এক বজরঙ্গকেই—যে ভিন্ন বাণীর বিগ্রহ। ছবিটির 'হিন্দুত্ব' নামেই আছে শ্লেষ। আর, আঙ্গিকের সরলতায় বর্ষীয়ান্ শিল্পীর বহু অভিজ্ঞতা পেরোনো উত্তরণ খুব স্বাভাবিক লাগে।

অন্য মাত্রায় অঞ্জলি এলা মেনন একই অবয়বে দুই ধর্মের প্রতিভূ-চরিত্রের রূপারোপ করেন তাঁর "রাম রহিম—দি ইন্‌ডিভিজিবল্ ইণ্ডিয়ান আণ্ডার সীজ" (siege) ছবিতে। কাঠের ফ্রেমের আড়াল থেকে অবরুদ্ধ যে ভারতীয়কে দেখি একই অবয়বে সে রাম এবং রহিম। হৃৎপিণ্ড, শিরা উপশিরার জটিল বিন্যাসে এবং গোটা অবয়ব জুড়ে নাগরী আর উর্দু হরফে রাম-রহিম শব্দ দুটি ছড়িয়ে দিয়ে একটা বুনট তৈরি করেছেন। বিপরীতিমুখী তীরে বিদ্ধ মানুষটির যেন ঘনিষ্ঠতা চায় একটি সাদা পায়রা। কাজটিতে প্রশান্তির অভাব আছে। সাময়িক আভিঘাতের প্রতিক্রিয়া প্রবল। তবুও চরিত্রটির চিত্রকল্পের জটিল বিন্যাস ছাপিয়ে মর্ম ছুঁয়ে থাকে চরিত্রটির সরলতায় বেদনায় মেশা দৃষ্টি। বি. আর. পানেসর-এর "হিউম্যানিটি অন দি ক্রস"-এ—অ্যাক্রেলিকের প্রয়োগে, অসমতল জমির সংবেদনে এবং মন্দির-মসজিদ-গির্জার গড়নের উপরে মোটা ক্রস চিহ্ন এঁকে দেওয়ায় সমকালীন সংকটের আসান সম্পর্কে শিল্পীর একটি সুনির্দিষ্ট অবলোকন সাক্ষাৎ হয়ে উঠেছে। এই ছবিগুলি একটি গুচ্ছ রাখা যায়।

আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত মানুষের চিত্রকল্প অনিবার্যভাবে এসেছে অনেকের কাছে। প্রদর্শনীতে ঢোকার মুখেই রাখা ছিল রামচন্দ্রন-এর একটি পুরানো বিখ্যাত ছবি "চেজ" (Chase, ১৯৭৫)। মুণ্ডহীন ছুটন্ত আক্রমণকারী এবং পলায়নপর আকৃতিগুলির পেশির বিন্যাসের ভয়ঙ্করত্বে এবং গোটা কাজটির মধ্যে সঞ্চারিত গতিময়তায় যে কোনো দর্শকই দেখবেন সাক্ষাৎ 'ত্রাস'। তেল রঙে করা এই ছবির আকারও বিরাট, ১১২″ × ৭২″। প্রদর্শনীটির একটি বড়ো অংশে এই আক্রান্ত মানুষের ত্রাস বিষয় হিশেবে ফিরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন শিল্পীর হাতে—রামচন্দ্রনের ছবি এই পর্যায়ের ছবির সামনে যাবার প্রস্তুতি-ভূমিকা রচনা করে দেয়। এই পর্যায়ে আসে ইউসুফ অড়াক্কল-এর "বম্বে জানুয়ারি ১৯৯৩," অমিতাভ ব্যানার্জীর "আন্‌টাইটেল্‌ড" (১৯৯৩), প্রভাকর বারওয়ে-র "ব্যালট্ বক্স" (১৯৯৩), বীণা ভার্গব-এর "আন্‌টাইটেল্‌ড' (১৯৯২-৯৩), বিকাশ ভট্টাচার্য-র" ফায়ার-ওয়ার্কস" (১৯৯৩), সঞ্জয় ভট্টাচার্য "ওয়াটার মেলন্‌স্" (১৯৯৩), যোগেন চৌধুরী-র ড্রয়িং "ফুল্‌স" (১৯৯৩), রিনি ধুমল-এর "দি স্লিপ অফ রিজন প্রডিউসেস্ মনস্টারর্স" (১৯৯৩), সুনীল দাস-এর "টুডে" (১৯৯৩), ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তর "ভায়োলেন্স এগেইন" (১৯৯২), শ্যামল দত্ত রায়-এর "ডিজাস্টার" (১৯৯৩), লক্‌সমা গৌড় এর ড্রইং "আন্‌টাইটেল্‌ড' (১৯৯৩), গণেশ হালুই-এর "ম্যান্‌ইটার" (১৯৯৩), রেবা হোর-এর "চিল্‌ড্রেন ওয়াচিং" (১৯৯২), শাম্‌সাদ হুসেন-এর "আন্‌টাইটেল্‌ড" (১৯৯৩), ওয়াসিম কাপুর-এর "আন্‌টাইটেল্‌ড" (১৯৯৩), সনৎ কর-এর লিথোগ্রাফ "এ ফ্লাওয়ার বীইং মার্ডার্ড" (১৯৯৩), প্রভাকর মহাদেও কোলতে-র "আন্‌টাইটেল্‌ড" (১৯৯২), রাম কুমার-এর "উন্‌ডস"—নামে দুটি প্যানেল, ইশা মহম্মদ-এর "ভিক্‌টিম" (১৯৯৩), পরেশ মাইতি-র "দি সিচুয়েশন" (১৯৯৩), নলিনী মালানি-র "এগেন্‌স্ট কমিউনিয়ালিজম" (১৯৯৩), চিত্রভানু মজুমদার-এর "আন্‌টাইটেল্‌ড" (১৯৯৩), তয়েব মেহ্‌তা-র "ফিগার অন এ রিক্‌শ" (১৯৯৩), কবিতা নায়ার-এর "কাফন্" (১৯৯৩), আকবর পদম্‌সী-র "গ্রিভিং য়োম্যান" (১৯৯৩), গোগি সরোজ পাল এর "রেড সরযূ উইথ আইজ" (১৯৯৩), মানু পারেখ-এর "স্যাক্‌রিফাইস" (১৯৯৩), গণেশ পাইন-এর "দি ডান্সার" (১৯৯৩), কমলা রায়চৌধুরীর "মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড" (১৯৯৩), সুহাস রায়-এর "ভিক্‌টিম" (১৯৯৩), পরিতোষ সেনের "ফায়ার অল অ্যারাউণ্ড" গুলাম মহম্মদ শেখ-এর "ওমিনাস আওয়ারস" (১৯৯৩), লালু প্রসাদ শ-র "গ্রাফিক-৯৩", লক্ষ্মণ শ্রেষ্ঠ-র "উন্‌ডস" (১৯৯৩), অর্পিতা সিং-এর "মুনা আপ্পা উইথ এ গোল্ডেন ম্যান্‌টল' (১৯৯২), অনুপম সুদ-এর "অ্যাপ্রিহেন্‌সন" (১৯৯৩) থোতা থারানি-র "উন্‌ডস" (১৯৯৩), এস. জি. বাসুদেব-এর "ম্যানস্কেপ" (১৯৯৩), বিশ্বনাথন-এর "ওয়াল" (১৯৯২)—৪০টি ছবি।

তারিখের দিকে নজর করলে বোঝা যায় '৯২ এর শেষ এবং '৯৩-এর গোড়ায় দেশ যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে গেল—সেই অগ্নি-বলয়ের তাপ এবং ত্রাস থেকেই ছবিগুলির সৃষ্টি—হয়ত এই প্রদর্শনীর আয়োজকদের তাগিদ ছিল। কিন্তু কোনও একটি ছবিকেও প্রচলিত অর্থে ফরমায়েসি কাজ মনে হয় নি। ধর্মের নামে যে ধ্বংসের শক্তিকে তাণ্ডবে মাতিয়ে দেওয়া হল এই সময়ে—তার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যই, গভীর দায় বোধ থেকেই এতজন শিল্পী সাড়া দিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকের আত্মবিকাশের ধাপগুলির সঙ্গে নিয়মিত প্রদর্শনী দেখেন এমন সকলের পরিচয় থাকার কথা। সেই অভিজ্ঞতায় বুঝবেন, প্রত্যেক শিল্পী এই সংকটকালে সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকেরই কাজে আছে তাঁদের নিজস্ব শৈলী, নিজস্ব সিগ্‌নেচর। এটা কোনও দলবদ্ধ কাজের প্রদর্শনী নয়। এক ছকে পোস্টার বানানো নয়।

শিল্পীদের আত্মনিষ্ঠ প্রত্যয়ের জমি থেকে, নিজস্ব শিল্প-ভাষায় এ প্রতিরোধের চিত্রমালা আমাদের সামনে এল বলেই বোধহয় দেশের প্রতি মানুষের দায়িত্বজ্ঞান এবং শিল্পীর সততা মিলে গিয়ে এত গভীরভাবে আমাদের স্পর্শ করে। একবার ঘুরে দেখায় এবং চকখড়ির লেখার মতো মুছে ফেলায় এ অভিজ্ঞতা মিলিয়ে যায় না। কোনও কোনও ক্যানভাসের চিত্রকল্প রীতিমতো বিঁধে থাকে মর্মের মধ্যে এবং নিরন্তর আশঙ্কা-ব্যাকুল বিভ্রান্ত মনকে যেন এক বিবেকবুদ্ধির শুদ্ধতার দিকে চালিত করে। আলোর অব্যাহত উৎসের মর্যাদা পায় এ প্রদর্শনীর বহু চিত্রকল্প। অবয়ব আশ্রিত, ফিগারেটিভ কাজগুলির মানুষজনের চোখ-মুখ শরীরের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব ছবি নিয়মিত দেখতে অভ্যস্ত নন এমন দর্শককেও প্রদর্শনী পরিক্রমার সময়ে থমকে থমকে যেতে দেখেছি। আকবর পদমসীর "গ্রিভিং য়োম্যান" ছবির বিশিষ্ট রেখা বিন্যাসে শরীরী হয়ে ওঠা সান্ত্বনার অতীত শোক বা বীণা ভার্গব-এর ক্যানভাসে "আন্‌টাইটেল্‌ড" অ্যাক্রেলিক রঙের তীক্ষ্ণতায় ধর্ষণ উন্মুখ পশুর আক্রমণের মুখে আর্তনারী কিংবা আগুনের হল্‌কায় ঝলসে যাওয়া মুখ ও শরীরের পুঞ্জ যেভাবে তেল রঙের তীব্র সংবেদনে বিকাশ ভট্টাচার্য ধরেন—"কায়ারওয়ার্ক" কাজটিতে—এই সব সাক্ষাৎ শরীর উপস্থাপনা সব স্তরের দর্শককেই টেনে রাখবে এবং এক অব্যর্থ শঙ্কা-ত্রাসের অনুভূতির মধ্যে টেনে নেবে। মুহূর্তে উপলব্ধি করাবে—যে ধ্বংসের বলয়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সেখানে আমরা সবাই এমন-ই আক্রোশ এবং দাহর সামনে আড়ালহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। রঙপ্রয়োগের এবং চিত্রকল্প প্রক্ষেপের অব্যর্থতা এসব পটের চিত্রবিষয়ের সঙ্গে দর্শককে একাকার করে দেয়। পরিতোষ সেনের, শামসাদ হুসেন-এর, ইশা মহম্মদ-এর, নলিনী মালানির, গোগি সরোজ পাল-এর, সুহাস রায়-এর, অনুপম সুদ-এর অবয়ব আশ্রয়ী কাজের সংবেদনও একই স্তরের। আক্রেলিকের অমসৃণতার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে অনুপম সুদ ("অ্যাপ্রিহেন্সন্") নগ্ন পুরুষদের একটি গ্রুপ করেছেন—যে অবয়বগুলির বিন্যাসভঙ্গি এবং মুখের অভিব্যক্তিতে আশঙ্কা ব্যাকুলতা চরম বিন্দু ছুঁয়ে থাকে। ছবিটি দেখা থাকলে স্মরণ করবেন, সামনে রাখা পেছন ফিরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো নগ্ন পুরুষটির কালচে লাল শরীর কেমনভাবে একটা বর্ণসংঘাতের চিত্রভাষা তৈরি করেছে। ছবির বক্তব্য এই বর্ণ-সংঘাতের ফলেই তীব্র প্রকাশরূপ পায়। সুহাস রায়ের "ভিক্‌টিম"-এ কাঠকয়লার রেখা ও রেশ (টোন) মিলিয়ে জেগে ওঠে মানহারানো এক অবিস্মরণীয় তরুণীর মুখ। আহত নারীত্বের এ ক্ষোভ এবং অভিমান স্মৃতিতে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। আহত মনুষ্যত্বের আর এক শুদ্ধ প্রতিমা অঞ্জলি এলা মেনন এঁকেছেন 'সিস্‌টার্স' নামে দুই বেদনাতুর নারী অবয়বে। তুলনায় (তুলনা না টানাই সঙ্গত) পরিতোষ সেন, ইশা মহম্মদ বা শামসাদ হুসেন-এর রঙপ্রয়োগে এবং অবয়বের বিন্যাসে ঝট্‌কা লাগে এবং তীব্র সংবেদন সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই শিল্পী এমন আঙ্গিক ব্যবহার করেন। নলিনী মালানির অনবদ্য কাজটির নাম "এগেইন্‌স্ট কমিউনালিজম"—কিন্তু কোনো শ্লোগানের দিকে যায় না। পটের মধ্যে রাখেন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার শিকার এক নারীকে ঘিরে শোকস্তব্ধ নানা বয়সী নারীদের। এমন ছবি উপলব্ধি আনে, মানহারা মানুষের খিন্নতার সমর্থ রূপায়ণ সরব প্রতিবাদের ভাষা থেকে কত বেশি তীব্র! তীব্র সংবেদনের প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ হবে রেবা হোর-এর "চিলড্রেন ওয়াচিং" নামে ক্ষিপ্র মাধ্যমের কাজটি। নিজস্ব আঙ্গিকে রেবা হোর বর্ণসংঘাত এবং মোটা রেখার বিভাজনে কোনও বিনাশের সাক্ষী শিশুদের অবয়ব এবং মুখ চোখের অভিব্যক্তি রূপবদ্ধ করেছেন। নিনা দালাল মৃতের স্তূপের মধ্যে সন্তান বুকে আগলে দাঁড়ানো বিবেশ নারীর অবয়ব এঁকেছেন বিরাট পটে। এখানেই উল্লেখ করতে হবে দুটি ভাস্কর্যের : শ্যামল রায়ের টেরাকোটা মূর্তি—হতবাক একটি মুখ, কাজটির নাম "হোয়াই", শক্তিমান ভাস্কর সুনীল দাসের কাইবার গ্লাস ও কাঠে করা মূর্তি "ডেস্পেয়ার", সন্তান বুকে আঁকড়ে ধরে আছে মা।

অবয়ব-আশ্রিত নয়, নির্যাসিত বোধ অনেকটাই প্রতীকী রূপকল্পে প্রকাশ করা হয়েছে—এমন অনেককটি ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। এ ধরনের কাজের সংবেদন অবশ্যই ভিন্ন স্তরের, সর্বদা হয়ত সাধারণ বোধ্যও নয়। চর্চায় অভ্যস্ত একটু শিক্ষিত দর্শক প্রত্যাশা করেন এই পর্যায়ের শিল্পীরা।

কলকাতায় কোন কোন শিল্পী-সংঘের কাজ অনেককাল একত্রিত দেখার অভ্যাসেই বোধ হয় সোসাইটি অফ কন্‌টেমপোরারি আর্টিস্ট-এর তিন শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জী, শ্যামল দত্ত রায় এবং গণেশ পাইন-এর কাজ তিনটি একগুচ্ছে মনে রয়ে যায়। অমিতাভ ব্যানার্জীর ছবিতে বাদামির উপরে ভেসে থাকা সাদার স্তর ভেদ করে জাগে ভেঙে পড়া কোনো কাঠামোর আভাস। আলো পেছনে থাকায় ছবির নিচের সীমা থেকে জেগে ওঠা এক রাশ চুলে ঢাকা মুখটিতে আঁধার জমে থাকে। শ্যামল দত্ত রায় সম্প্রতি "ডিসাস্‌টার"

সিরিজে কয়েকটি ছবি করেছেন, যার একটি—ভাঙা ক্রশ-এর ছড়ানো টুকরোয় আকীর্ণ একটি পট ছিল এই প্রদর্শনীতে। এ পটখানির পুরোভাগে বিশেষ নজর পড়বে পেরেকে বেঁধানো হাতের টুকরোটিতে। এই বিচ্ছিন্ন, আহত হাতখানি হয়ে ওঠে প্রধান চিত্রকল্প। একই বাদামি রঙের ঘনানো বিষাদের বাতাবরণে দেখি গণেশ পাইনের নিজস্ব চরিত্র-কল্পনার ধারায় করা সাম্প্রতিক কাজ "দি ডান্‌সার"। আবৃত শরীর এক পুরুষ মূর্তি ঠিকই নাচের তাল রাখা একটি মুহূর্তে স্থগিত রয়েছে ক্যানভাস জুড়ে। ডান হাতে একটি কপোত উড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতে উদ্যত রেখেছে নিধনের হাতিয়ার। যেমন হয় গণেশ পাইনের হাতে, বাস্তবতার অন্তর্গত কোন বাস্তব অব্যর্থ চিত্রকল্পে ধরা দেয়, তেমনি আবেদন আছে এ ছবিতেও। এমন ছবি সত্যিই দর্শককে ধাক্কা দেয় না, বরং উত্তেজনা সংযত করে ভেতর-বাস্তবের গভীরে টেনে নেয়। এবং সেই স্তরে উপলব্ধি হতে পারে—হননে উদ্যত নৃত্যপর এ বিমর্ষমূর্তি বুঝি বা আমারই, আমাদের সকলেরই নষ্ট সত্তার কায়া। সত্যি বলতে কি এ রকম কাজ আমাদের নিজেরই মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

দুঃসময়ের বাস্তবতা ভেতরের দিক থেকে ধরার আর-এক নজির মেলে গুলাম মহম্মদ শেখ-এর "ওমিনাস আওয়ার্স" ছবিতে। তাঁর উপস্থাপনা পরাবাস্তববাদী চিত্রকলার আঙ্গিক স্মরণে আনে। ভিন্ন মাত্রায় তায়েব মেহ্‌তার "ফিগর অন এ রিক্‌শা" কাজটিও এই দুঃসময়ে বিপর্যস্ত মানুষের শরীরী উপস্থাপনা; তাৎপর্যময় চিত্রকল্পের অমোঘ সংবেদনের দিক থেকে চিত্রভানু মজুমদারের "আন্‌টাইটেল্‌ড"ও একটি অবিস্মরণীয় ছবি। গভীর নীল অন্ধকারের পটে আহত এবং পিষ্ট মানুষের দুখানি হাতের বিশেষত শূন্যে বাড়ানো হাতের আকুলতায় বিপর্যস্ত মনুষ্যত্বের চিত্রকল্প সংহত হয়ে থাকে। পটের উপরে অনেকটা স্পেস ছেড়ে রাখায় অসহায়তায় আর্তি যেন এক পরিব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

এ ত খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক যে আক্রমণ এবং ধ্বংসকেই চরম বলে মানবেন না কোন শিল্পী। এত বড়ো প্রদর্শনীতে বিপরীত মাত্রায় আশ্বাসের, আস্থার ধ্রুবত্ব জায়গা না পেলে খুবই অসম্পূর্ণ বোধ হত, ঠিক যেন শমে পৌঁছত না। আক্রান্ত মনুষ্যত্বের প্রতিক্রিয়ার নানান মাত্রার অভিব্যক্তির এই সংগ্রহের মাঝে চিন্তামণি কর-এর "বুদ্ধ" নামে টেরাকোটা বা আমিনা কর-এর পুরানো গ্রাফিক প্রিণ্ট" বুদ্ধ অ্যাজ এ মেণ্ডিক্যাণ্ট" দর্শকের আবেগতাড়িত মনকে আশ্বস্ত করে, স্থিতধী হতে সাহায্যই করে। স্বয়ং মকবুল ফিদা হুসেন-এর প্রগাঢ় মনন এবং আন্তরিকতায় সম্পন্ন আনকোরা নতুন কাজ "মায়া—বার্থ অফ বুদ্ধ"-এও খুব তাৎপর্যে প্রসূতি মায়ার গর্ভ থেকে সাদা হাতির প্রতীকে শান্তির প্রতিমূর্তি বুদ্ধের আবির্ভাবে সানন্দ অভ্যর্থনা জানায় মায়ার হাতের উপরে নৃত্যপর গণেশ। ছবির ডান দিকে নিচ থেকে জেগে উঠছে উড়ন্ত গতিময় একটি সাদা ঘোড়া। জমাট এই কম্পোজিশনের উপরে তির্যকভাবে নেমে আসা তীক্ষ্ণ কালো একটি ফলা আঘাত করেছে মায়ার শরীরে। ছবিটির সামনে সুন্দর একটি জলভরা পাত্রে রাখা ছিল পদ্মপাতা এবং লাল ফুলের পাপড়ি। অনেক সময় হুসেন তাঁর অসামান্য দক্ষতা নিয়ে শিল্পের যে সব কারদানিতে তাক লাগান—এই কাজটিতে কোথাও তেমন উচ্ছলতা ছিল না। নানামুখী ব্যঞ্জনায় বহুমাত্রিক আবেদন সম্পন্ন "বুদ্ধের জন্ম" তাই আমাদের সম্ভ্রমে আনত করে আনে।

এবং নিবিষ্ট দর্শকমাত্রেই নিশ্চয় বার বার সোমনাথ হোর-এর ব্রোঞ্জ "কাম্‌প্যাশন" পরিক্রমা করেছেন, মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য শিশুকে বুকে আঁকড়ে রাখা মা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত বোধ করেছেন, নিশ্চয়ই প্রদর্শনী থেকে বেরোবার আগে পি. ভি. জানকীরামের তামার কাজ, প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ-রূপ "ট্রি অফ লাইফ"-এর সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে পবিত্র শ্বাস নিয়েছেন।

দেশের এমন সংকটকালে শুভচেতনার পক্ষ নিয়ে এমন একটি তাৎপর্য-সমুজ্জ্বল প্রদর্শনী সংগঠনের জন্য সিমাকে (সেণ্টার অফ ইণ্টারন্যাশনাল মডার্ন আর্ট) আন্তরিক অভিনন্দন।

* * * *

সংযোজন : বরোদায় গুলাম মহম্মদ শেখ এবং বম্বেতে মকবুল ফিদা হুসেন সম্প্রতি মৌলবাদী ধর্মান্ধদের হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই লজ্জাজনক আচরণের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করে দেশের দুই অগ্রগণ্য শিল্পীর উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানাই।

বলা সহজ, করা কঠিন : শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

সনাতন মিত্র

যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় না বলে আমরা যা সম্ভবপর —তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবার চেষ্টা করি। গণতন্ত্র ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল পৃথিবীর কোথাও তা হয়নি, কোন কালে হবে, তারও আশা নেই। সেই আদর্শের দিকে এগোবার চেষ্টা করতে পারি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পদে পদে বাস্তবের কাছেও নতি স্বীকার করতে হয়। তবে, শ্রেয়ের একটা বোধ, তার একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে থাকা চাই বইকি, তা না হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সভ্যতার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

শিক্ষার আদর্শটা কী? আমরা খুব মোটা দাগের একটা ছবি কল্পনা করতে পারি। একজন উপযুক্ত শিক্ষক, একজন উপযুক্ত ছাত্র, একটি শিক্ষণীয় বিষয় অথবা বিদ্যা, অনুকূল পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এবারে এই বাক্যটির, যাকে বলে ভাব-সম্প্রসারণ, তাই করে গেলেই ছবিটা পূর্ণতা পেতে থাকবে। উপযুক্ত শিক্ষক আমেরিকায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউট অব অ্যাডভানসড স্টাডিস-এর অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও হতে পারেন, আবার শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-উপন্যাসের বৃন্দাবন পণ্ডিতও হতে পারেন, উপযুক্ত ছাত্রের আগ্রহী মুখ দেখা যেতে পারে অকসফোর্ডের বিশ্ববিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরিতে কিংবা পশ্চিমবঙ্গের কোন গ্রামের ইস্কুলের জরাজীর্ণ ক্লাস ঘরে; শিক্ষণীয় বিষয় সিম্বলিক লজিক হতে পারে, আবার সরল সমীকরণ হলেও চলে; প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলতে বসবার মাদুর আর লিখবার স্লেট-পেনসিল থেকে আরম্ভ করে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির যাবতীয় সরঞ্জাম, সবই বোঝায়। আসল কথাটা হল, যিনি শেখানে তিনি নিজে জানেন কিনা এবং শেখাতে সক্ষম ও আগ্রহী কিনা; যিনি শিখবেন তাঁর শিখবার ক্ষমতা ও প্রয়োজন আছে কিনা। বাকি যা থাকল, অর্থাৎ পরিবেশ এবং বই-পত্র, যন্ত্রপাতি, চক, ব্ল্যাকবোর্ড, ইত্যাদি সে-সবের ব্যবস্থা থাকবে সেটা ধরেই নিতে হয়।

বাস্তবে দেখা যায়, আমাদের শিক্ষক আদর্শ শিক্ষক নন, আমাদের ছাত্র আদর্শ ছাত্র নন, শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রের এবং সমাজের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ। কথাটা এই ভাবে বলা, মনে হতে পারে যে হঠকারিতা, মনে হতে পারে যে আদর্শ না হলেও আদর্শের কাছাকাছি শিক্ষক আমাদের আছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এমন অনেককে পাওয়া যাবে, যাঁরা সবদিক থেকে সুযোগ্য, এবং এমন অনেক শিক্ষা অথবা বিদ্যার আদান-প্রদান দেশে চলছে যা প্রকৃতই শিক্ষণীয়। ঠিক কথা। তবে রাজ্যব্যাপী কোনও শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে গেলে ধরে নিতে হয় সংশ্লিষ্ট সকলের এবং সবকিছুর মধ্যেই ঘাটতি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সে-সব ঘাটতি যতটা সম্ভব দূর করা যেমন একটা লক্ষ্য, তেমনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘাটতি যে থেকে যাবে, সেটা হিসেবের মধ্যে রেখে, সেই অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা করাও দরকার। যে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিপুল-সংখ্যক মানুষ জড়িত তার উপযোগিতা যাতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হয় সেজন্যে প্রয়োজন হয় বিপুল-পরিমাণ বিধি-নিয়ম। এইভাবেই এগোতে হয়, বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে।

এবং আদর্শের ওপর চোখ রেখে, লক্ষ্যের কথা ভুলে না গিয়ে। অন্য কিছুর বেলায় ততটা না হোক, অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই একটা কথা কিছুতেই ভুললে চলে না, যে বিধি-নিয়ম দিয়ে তাকে যতই শক্ত করে বাঁধা হোক, শেষ পর্যন্ত দুটি ব্যক্তির যোগতার ওপরই শিক্ষা নামক প্রক্রিয়ার ফলাফল নির্ভর করে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট দেখা যায়, নানা বিষয়ে তাঁরা খুবই বাস্তববাদী দৃষ্টিতে শিক্ষার

বর্তমান অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে, যতই না কেন উচ্চকণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করে থাকুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাতে উৎকর্ষ লাভ করে সে জন্যে: The faculty must not only be outstanding merit, but also be adequately motivated to pursue higher learning and research (9 : 18) সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও ব্যক্ত করতে ভোলেন নি যে শুধু ইস্কুল কিংবা কলেজই নয়, also the university by themselves will be unlikely to take the initiative in the matter. (10 : 16) যাতে বছরে অন্ততঃ ২২০ দিন ক্লাস হয়, যদিও ইউ. জি. সি. তাই সুপারিশ করেছে। তার মানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ শিক্ষকদের কথা দূরে থাক, এমন কি, "outstanding merit" সম্পন্ন "dedicated" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ওপরেও এমন ভরসা রাখা যায় না যে তাঁরা বাধ্য না হলে নিজেদের ন্যূনতম কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

মনে রাখতে হবে, কমিশনের এই উক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক আধজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্পর্কে নয়, সম্মিলিত ভাবে সেই অধ্যাপকদের সম্পর্কে। তা যদি না হত, এ ভরসা নিশ্চয়ই রাখা যেত, সম্মিলিতভাবে যাঁদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিচালনার ভার থাকা উচিত, সেই অধ্যাপক সমাজ অবশ্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা করে অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে ফাঁকি দিতে চাইবেন না। সে ভরসা তাঁদের ওপর রাখা যায় না, অথচ তাঁরা উচ্চ গুণের অধিকারী, শিক্ষা এবং এবং গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ!

অতএব শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষকদের ওপর জবরদস্ত নজরদারি প্রয়োজন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় তে বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রেও। তার মানে, শিক্ষা জগতে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, শীর্ষস্থানীয়, মুখে তাঁরা যতই শিক্ষা সংক্রান্ত স্বাধীনতার, বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলুন, ঊর্ধ্ব লোকের কোনও এক কর্তৃপক্ষের শাসন বাতিরেকে তাঁরা যে স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থাকবেন, তার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উচ্চতর শিক্ষায় বিপুল ব্যয়ভার তে সরকারকে বহন করতেই হয়, তার ওপরে অধ্যাপকেরা বছরে ছুটি কত দিন পাবেন, সপ্তাহে ক্লাস কটি নেবেন, এসবও যদি তাঁদের সম্মিলিত প্রজ্ঞা এবং দায়িত্ববোধির ওপর ছেড়ে না দেওয়া যায়, তখন আর সেই স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির পায়ের তলাকার মাটিটা কোথায় থাকে? শিক্ষা কমিশন এ-সব প্রশ্নের ভিতরে প্রবেশ করেননি, আমাদেরও বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠক্রম ঠিকমত পড়াতে গেলে কতগুলো লেকচার এবং টিউটোরিয়াল ইত্যাদি প্রয়োজন, অর্থাৎ এক একটি শিক্ষাবর্ষে কতগুলো ক্লাসের ব্যবস্থা করা দরকার, তাও যদি অশিক্ষক কর্তৃপক্ষকে হুকুম জারি করে বলে দিতে হয়, তারপরে আর শিক্ষার সর্বস্তরে অবনতির কারণ অন্য কোথাও খুঁজে বেড়াবার দরকার থাকে কিনা, সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সত্যি সত্যিই সেই অবস্থা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে কিনা তা নিয়ে কমিশন নিজেরা যে খুব শ্রমসাধ্য কোনও অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তাঁদের রিপোর্টে তার পরিচয় নেই। তাঁরা বলেছেন:

One frequent grievance aired before the Commission is in regard to the spate of holidays and vacations in educational institutions which make it very difficult to implement the U. G. C.-directed suggetion to have minimum of 220 working days

অনেক অভিযোগ তারা শুনে থাকতে পারেন, কিন্তু সে অভিযোগ কতদূর যথার্থ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজকর্ম কী রকম, অতিরিক্ত ছুটির ফলে পড়াশোনার ঘাটতি কী রকম হয় ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের নিজস্ব কোনও পর্যবেক্ষণ তাঁরা রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করেন নি, শুধু তাই নয়, প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে আরও বড় অভিযোগ আছে কমিশনের:

The universities have···largely assumed the form of degree-giving departmental stores, with the stress on widening the range of products while diluting their quality.

তাঁরা আরও বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার লাঘব করবার জন্যে অন্য যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, সেখানেও একই অবস্থা:

Research, and the advancement of this frontiers of knowledge, which ought to be this preponderant concern of universities, have by and large fallen into disuse in their care too.

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডিগ্রির বেসাতি করা হয়, জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের কাজ বন্ধ, গবেষণাও চালু নেই। অর্থাৎ, পয়সা দিলেই ডিগ্রি পাওয়া যায়, গবেষণায় সুযোগ-সুবিধা কেউ বিশেষ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন না। এ বড় সাংঘাতিক কথা। কিন্তু কী করে জানা গেল? কমিশন নিজে কি এ নিয়ে খোঁজ-খবর করেছেন, পরীক্ষার পদ্ধতি, ডিগ্রি প্রদানের মাপকাঠি যাচাই করে দেখেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজ কী চলছে, না চলছে, তা নিয়ে কোনও অনুসন্ধান করেছেন? গবেষণার জন্যে বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ অর্থ কীভাবে বরচ করা হয়, খতিয়ে দেখেছেন? হতে পারে এ সব অভিযোগই বহুল পরিমাণে সত্য। (কমিশনও অবশ্য বলেছেন, 'by and large') কিন্তু উচ্চশিক্ষার অবস্থা সত্যিই এমন শোচনীয় কিনা, কমিশন নিজস্ব অনুসন্ধান ও সমীক্ষার সাহায্যে তা নিরূপণ করবার দায়িত্ব কেন নেননি, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য-সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত আটটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনটির আর্থিক অবস্থা কেমন তার বিবরণ কমিশন লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে অনটনের চিত্রটা স্পষ্ট দেখা যায়। কী উপায়ে সে অনটন লাঘব করা যায়, সে ব্যবস্থার কথাও আছে তাঁদের সুপারিশে। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ এমন অনটন সত্ত্বেও খরচ হচ্ছে, তা সত্যিকারের, কী কাজে লাগছে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত যাঁরা তাঁরা প্রকৃত অর্থে কতখানি অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের শিক্ষায়, গবেষণা যাঁরা করছেন (ধরে নেওয়া যাক, এখনও কেউ কেউ করছেন) তাঁদের পরিশ্রমের ফলে নতুন কী সংযোজিত হচ্ছে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এ-সবের হিসেব নেবার কোনও প্রাথমিক প্রচেষ্টারও পরিচয় তাঁদের রিপোর্টে নেই।

গবেষণার কথাটা আপাততঃ ছেড়েই দেওয়া যাক (কেন না আমাদের এই আলোচনার পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ), কিন্তু শিক্ষা, পরীক্ষা এবং ডিগ্রি, তিনটিকে একসঙ্গে ধরলে দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব অপরিসীম, সে কথা মানতেই হয়, আর সেই জন্যেই তা নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। শিক্ষান্তে পরীক্ষা, আর পরীক্ষার ফলে ডিগ্রিলাভ। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকই যদি পয়সা নিয়ে ডিগ্রি বেচত, সে ডিগ্রির মূল্য এখন যতটুকু আছে, তাও থাকত না। কিন্তু ডিগ্রির মূল্য যে সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে, তাতে ভুল নেই। তার মানে, বিদ্যার মানযন্ত্র হিসেবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কমে গেছে। তার কারণ, যে শিক্ষার অন্তে পরীক্ষার ব্যবস্থা, সেই শিক্ষাই তার কার্যকরতা হারিয়েছে। একটা সত্য অত্যন্ত দৃঢ় এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা দরকার। কোনও শিক্ষা ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না, যদি দেখা যায় ছাত্রদের শতকরা আশি কি নব্বই জন পরীক্ষায় ফেল করলেন। সেই সম্ভাবনা নিবারণ করবার জন্যে, আরও ভাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হয়। তার জন্যে দুটি শর্ত পালন করা দরকার: (১) শিক্ষকেরা সেই স্তরে শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন এবং যত্নশীল হবেন, (২) ছাত্ররা সেই স্তরের শিক্ষা-লাভের যোগ্য হবেন। এই দুটি শর্ত যখন পালিত হয় না, অর্থাৎ উপযুক্ত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না, তখন পরীক্ষা নিয়েই এমন কারচুপি করতে হয় যাতে ফেলের হার বিপর্যয়কর না হয়ে ওঠে। এ রকম পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করেন, তাঁদের এক বৃহৎ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি-ধারী হলেও, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারেন নি। এঁরাই আবার যখন ছোটবড় শহরে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন, তখন তাঁদের ছাত্রেরা যে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করবে সে রকম আশা অযৌক্তিক।

কমিশন পরীক্ষাব্যবস্থার সংশোধনের নানারকম সুপারিশ করেছেন। যেমন বৎসরান্তিক একটি পরীক্ষার বদলে সারা বৎসর ধরে মূল্যায়নের ব্যবস্থা, এমন প্রশ্নপত্র রচনা যাতে ছাত্রদের comprehension এবং expressions-এর পরীক্ষা হয় ইত্যাদি। কিন্তু পরীক্ষার যতই সংস্কারের চেষ্টা করা হক, শিক্ষায় যদি ঘাটতি থেকে যায়, পরীক্ষা-প্রণালী আবার ঘুরে এসে সেখানেই দাঁড়াবে, যেখানে পাশের হার ছাত্রদের, তাদের বাবা-মায়েদের এবং সমাজের প্রত্যাশায় খুব নিচে না নামে।

এবং প্রাইভেট টিউশনিও চলতে থাকবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে। এর একমাত্র প্রতিকার হতে পারে, যদি, প্রাথমিক স্তরের পর থেকে প্রত্যেক স্তরে প্রবেশার্থী ছাত্র সেইস্তরের শিক্ষালাভের যোগ্যতা নিয়ে আসেন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সকলকেই গ্রহণ করতে হবে, এ কথা মেনে নিয়েও এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে প্রাথমিকের পর মাধ্যমিকে প্রবেশের সময়, এবং মাধ্যমিকের একের পর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার সময়ে ছাত্র যে প্রকৃতই শিক্ষার ক্রমান্বিত পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আসছে, সেটা সুনিশ্চিত করা দরকার। তারপর উচ্চতর শিক্ষার কথা। কমিশন বলেছেন, বৃত্তিমুখী শিক্ষা আরও ব্যাপকভাবে ও সার্থকভাবে চালু

করতে পারলে উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর চাপ কমে আসবে। অবশ্যই কমবে, এবং সেটা যে অতিশয় বাঞ্ছনীয়, তাতেও কোনও ভুল নেই। কিন্তু এ চেষ্টা এতদিন কেন সফল হয়নি, কেন বছরের পর বছর সাধারণ শিক্ষার ওপর চাপ বেড়েই গেছে, তার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান না করলে, এবং সে অবস্থার প্রতিকার না করলে, কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও যে সে প্রচেষ্টা এবার ফলপ্রসূ হবে, তার সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যায় না।

যতদিন তা না হচ্ছে, আর কিছু করবার নেই বলে যতদিন ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার প্রাঙ্গণে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন ততদিন কোনও সংস্কার প্রচেষ্টাতেই কোনও ফল হবে না। এবং আগেই বলেছি, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং ক্লাস, ইত্যাদি ব্যবসা দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠবে। কমিশন বলেছেন, আমাদের শিক্ষা এখন অতিশয় পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, তাই প্রাইভেট টিউশনের এত বাড়-বাড়ন্ত। আমাদের শিক্ষা বরাবরই পরীক্ষা-কেন্দ্রিক-প্রথা ছিল (প্রাচীন গুরুশিষ্য পরম্পরার কথা বাদ দিলে)। কিন্তু প্রাইভেট টিউশন, কোচিং ক্লাস ইত্যাদি এখন যে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার কারণ অনুপযুক্ত ছাত্ররা আগে কোনদিন উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেননি।

এর দরুন যে বিপুল অপচয়, শিক্ষার যে নিদারুণ অব-মূল্যায়ন তা রোধ করতে পারে একমাত্র এমন ব্যবস্থা যাতে নানাদিকে নানা বৃত্তিতে আমাদের তরুণ-তরুণীরা ছড়িয়ে পড়তে পারেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজেরও দ্বার একমাত্র তাঁদেরই জন্য খোলা থাকে যাঁরা সেখানে প্রবেশের উপযুক্ত। কমিশন বলেছেন, There is no unrestricted entry into university. অবাধ প্রবেশ নেই সত্য, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষায় আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন আছে।

একমাত্র তা হলেই আমরা সেই অবস্থার আরেকটু কাছা-কাছি আসতে পারব, যখন একজন উপযুক্ত শিক্ষক একজন উপযুক্ত ছাত্রকে নিয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানে ব্রতী হতে পারেন। এখনও বোধহয় সে সময় আসেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যি-কারের সংস্কার আনতে গেলে যে বিপুল রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন, তার লক্ষণ কোথাও চোখে পড়ে না। ফুটপাথ থেকে তিনটে হকার তুলতে গিয়েও সর-কার ভয়ে পিছিয়ে আসেন।

এবং অপরিসীম আত্মসন্তুষ্টির অধিকারী আমাদের শাসন-কর্তা এবং তাঁদের পরামর্শদাতারা। একটা দৃষ্টান্ত শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট থেকেই দেওয়া যায়।

মাধ্যমিক পাঠক্রমে ইংরেজির পাঠক্রম কী রকম চলছে, ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তার একটি সমীক্ষার ফল এই রিপোর্টের সঙ্গে কমিশন বিনা মন্তব্যে প্রকাশ করেছেন। (মনে রাখতে হবে, এই সমীক্ষা কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় নেওয়া হয়েছিল।) ছাত্রদের প্রশ্ন করা হয়: শ্রেণী কক্ষে ইংরেজিতে কথা বলার ও শোনার সুযোগ কতখানি আছে?

উত্তরদাতাদের শতকরা ৬৫ জন বলে, ভাল সুযোগ আছে। সমীক্ষকের মন্তব্য: From this one can say that whatever the way of teaching might be, students, by and large get the opportunity of speaking and listening to the language in the class-room.

এবারে আরেকটি প্রশ্ন। তার উত্তর আরও শ্বাস-রোধকর।

Class-room-এর বাইরে ইংরেজি শোনার সুযোগ পাও কিনা?

শতকরা ৫৯ জনের উত্তর, হ্যাঁ।

সমীক্ষকের মন্তব্য: From this one can guess that there is a fair amount of exposure to English outside the class-room situation.

এর পরে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।